ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর-ই-খোদা
জুলিয়েট রোজেটি

১৪ জুলাই ২০১৪

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর-ই-খোদা
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

জুলিয়েট রোজেটি
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

কৃতজ্ঞতা

প্রতিবেদন প্রণয়নে মূল্যবান মতামত দিয়ে সমৃদ্ধ করার জন্য ওয়াহিদ আলম, সাধন কুমার দাস, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায়, তাসলিমা আকতার, শাম্মী লায়লা ইসলাম, শাহনুর রাহমান, মোরশেদা আকতার, নাহিদ শারমীন, নীনা শামসুন নাহার, রুমানা শারমিন, নীহার রঞ্জন রায়, শরীফুল ইসলাম ও গবেষণা বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা। চট্টগ্রামে তথ্য সংগ্রহ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের জন্য মো. জসীম উদ্দিন ও জাফর আহমেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির মূল লক্ষ্য। এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৫ সাল থেকে দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি খাতের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরূপণ ও এসকল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গবেষণা করছে। টিআইবি ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটির ওপর ৩টি প্রতিবেদন (২০০৫, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে) প্রকাশ করা হয়।

আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজ উভয় প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন বাস্তবায়ন করা হয়। অটোমেশন বাস্তবায়নের পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। অন্যদিকে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের অভিযোগ বিভিন্ন গণমাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে । এ প্রেক্ষাপটে অটোমেশনের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ তুলে ধরার জন্য এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, অটোমেশন বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত প্রায়োগিক সফলতা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মতেও শতভাগ অটোমেশন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। অটোমেশন বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে পণ্যের শুল্কায়ন এবং আমদানি পণ্য ছাড় ও রপ্তানি পণ্যের জাহাজীকরণ প্রক্রিয়ায় আমদানিকারক-রপ্তানিকারক প্রতিনিধিদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে লেনদেনের সুযোগ বিভিন্ন ধাপে এখনও বিদ্যমান। ফলশ্রুতিতে অনেক ক্ষেত্রে পণ্যের শুল্কায়ন, পণ্য ছাড় ও জাহাজীকরণ প্রক্রিয়ায় অনৈতিক ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী পক্ষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার কারণেও অনৈতিক লেনদেনের চর্চা দেখা যায়। পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করার সুযোগে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের এই ধারাবাহিক চর্চা অটোমেশনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। প্রতিবেদনে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। টিআইবি'র প্রত্যাশা এই সুপারিশগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হলে অটোমেশনের সফল বাস্তবায়ন অর্জন করা সম্ভব হবে।

এই গবেষণা সার্বিকভাবে পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মনজুর-ই-খোদা এবং জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া টিআইবি'র অন্যান্য কর্মকর্তাদের মূল্যবান মতামত প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের কর্তৃপক্ষের সহায়তা ও মূল্যবান মতামতের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া অন্যান্য সকল অংশীজন যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

১.১ প্রেক্ষাপট

চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দর কার্যক্রম শুরু করলেও ১৯১০ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রকৃত অর্থে চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশ সরকারের শিপিং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের প্রায় ৮৭ শতাংশ পরিচালিত হয়।[২] বন্দরের প্রধান কাজ হল বন্দরের নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন, এর অভ্যন্তরে ও বন্দরের প্রবেশ পথে পর্যাপ্ত ও কার্যকর সেবা, পণ্য পরিবহন ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং জাহাজের চলাচল, বার্থিং এবং নৌ-পথ নিয়ন্ত্রণ।

বিগত পাঁচ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পরিবহণের তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এই বন্দরের মাধ্যমে মোট পণ্য আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে ক্রমবর্ধমান। তবে পণ্য রপ্তানি অপেক্ষা পণ্য আমদানির পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি। একইভাবে এই বন্দরের মাধ্যমে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ৩.৮৩ কোটি মেট্রিক টন পণ্য আমদানি ও প্রায় ৫১ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য রপ্তানি হয়। কন্টেইনারের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট কন্টেইনারের পরিমাণ ১১.০৮ লক্ষ টিইইউস হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ সালে ১৪.৬৯ লক্ষ টিইইউসে পৌঁছেছে।

চিত্র ১: চট্টগ্রাম বন্দরে বছরওয়ারি আমদানি-রপ্তানি পণ্য এবং কন্টেইনার পরিবহণের চিত্র (২০০৮-২০১৩)

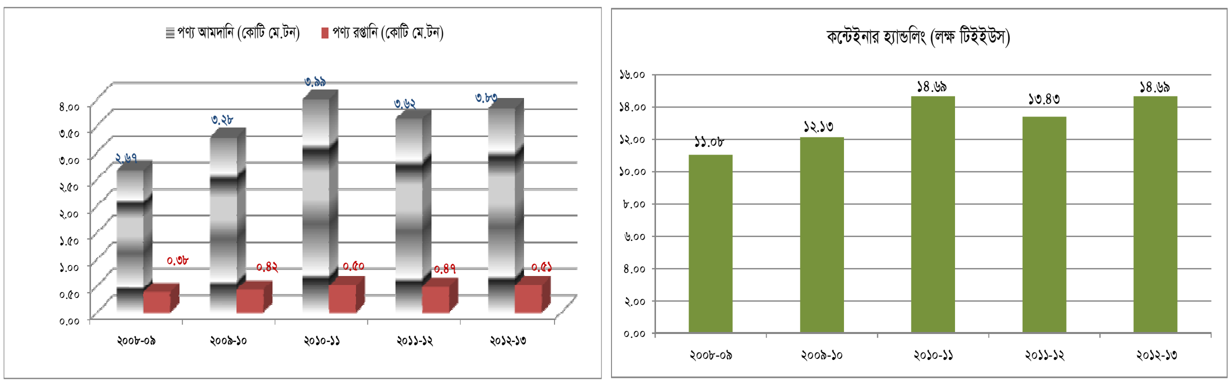

চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বন্দরের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১১.৫৫ শত কোটি টাকা, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫.৭০ শত কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় হতে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয় এবং সরকারকে প্রায় ৪.৩৬ শত কোটি টাকা আয়কর দেওয়ার পরও বন্দরের নিজস্ব আয় প্রায় ৩.৩১ শত কোটি টাকা।[৩]

চিত্র ২: চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয় ও আয়কর পরিশোধের চিত্র (২০০৮-২০১৩)

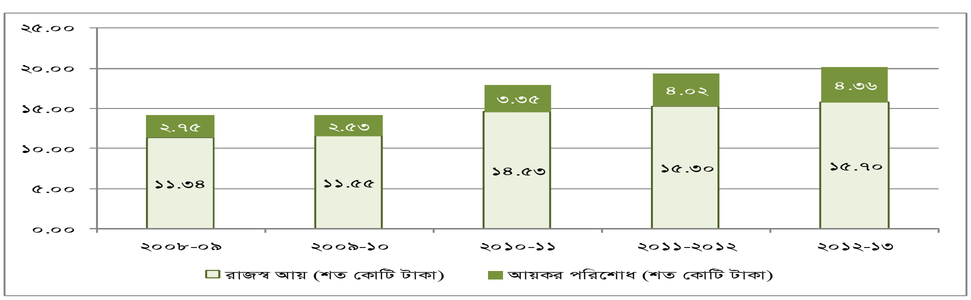

বিগত অর্থবছরগুলোর সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, প্রতি বছর বন্দর থেকে রাজস্ব আয় এবং এর সাপেক্ষে সরকারকে আয়কর প্রদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

[১] http://www.worldportsource.com/ports/review/BGD_Port_of_Chittagong_2102.php, accessed on 7 May 2014.
[২] Overview 2013, Chittagong Port Authority; http://www.bsbk.gov.bd/images/stories/BLPA/statistics.pdf; http://www.mpa.gov.bd/statistic/sheet1.pdf accessed on 04 May, 2014
[৩] চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, ৪ মে ২০১৪।

চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ ও বন্দরের রাজস্ব আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুসারে বন্দরের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বন্দরে জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল গড়ে ৫.০৭ দিন, যা সর্বশেষ ২০১২-১৩ অর্থবছরে সামান্য কমে গড়ে ৪.৯১ দিনে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, কন্টেইনার থ্রো-পুট বা প্রতিদিন জাহাজ-প্রতি কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের গড় পরিমাণ ২৯০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯০ তে উন্নীত হয়েছে। সার্বিকভাবে বন্দরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে এশিয়ার ১৭টি দেশের মোট ৬৯টি কন্টেইনার টার্মিনালের ওপর পরিচালিত "বেঞ্চ মার্কিং দ্য ইফিশিয়েন্সি অফ এশিয়ান কন্টেইনার পোর্টস" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দরকে সবচেয়ে দক্ষ বা কার্যকর কন্টেইনার টার্মিনাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (Munisamy and Sing, 2011)। এক্ষেত্রে দক্ষতা পরিমাপের জন্য প্রতিটি বন্দরের বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা- বার্থের দৈর্ঘ্য, টার্মিনালের আয়তন, রিফার পয়েন্টের (Reefer Point) সংখ্যা; এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি- গ্যান্ট্রি ক্রেন, স্ট্রাডল ক্যারিয়ার, ফর্ক লিফটার প্রভৃতির সংখ্যার সাপেক্ষে বার্ষিক মোট কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সংখ্যাকে বিবেচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে কন্টেনারাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার বুক, ২০০৭ এর তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে, চট্রগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বন্দরের তুলনায় বেশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সংখ্যার ওপর সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রভাব, বন্দরে কন্টেইনার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনৈতিক লেনদেন বা অনিয়ম দুর্নীতির প্রভাবসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে কন্টেনারাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল ইয়ারবুকের র‌্যাংকিং অনুযায়ী বিশ্বের ১০০টি সেরা বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থানের ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হয় - চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান যেখানে ২০১০ সালে ছিল ৮৮তম, সেখানে ২০১১ সালে ৮৯তম এবং ২০১২ সালে ৯০তম অবস্থানে নেমে এসেছে।[৪]

চিত্র ৩: চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার তুলনামূলক চিত্র (২০০৭-২০১৩)

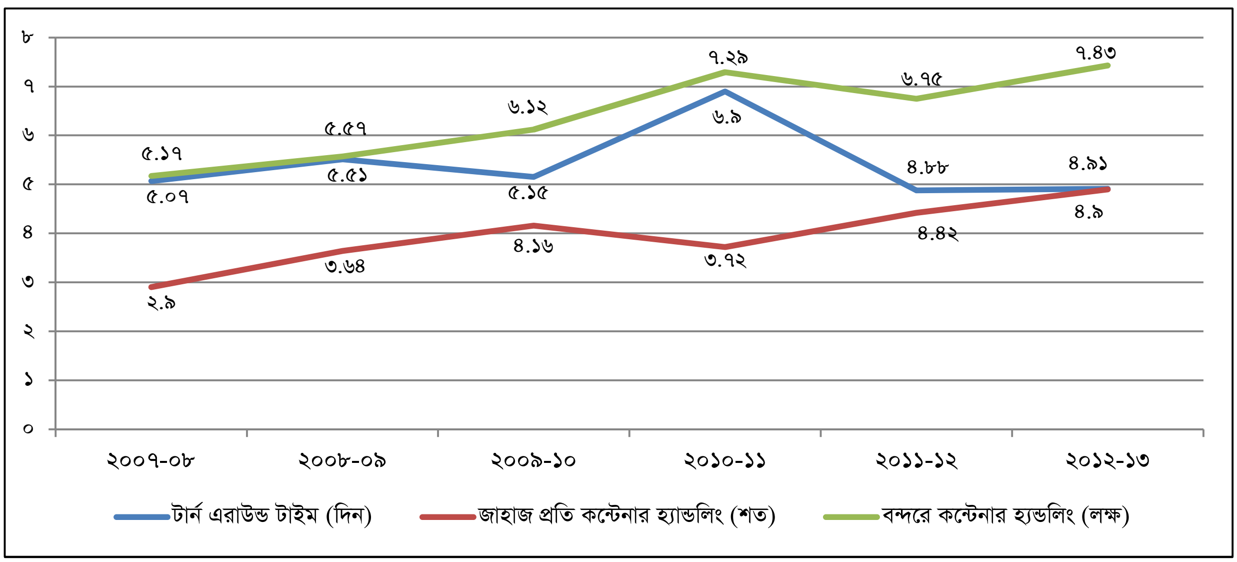

চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেশের প্রধান রাজস্ব প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, যা মূলত চট্টগ্রাম বন্দর, বেসরকারি আইসিডি (ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো), চট্টগ্রাম ইপিজেড ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের কাস্টম কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ও সিইপিজেডে নিয়মানুযায়ী অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে কর ও শুল্ক নির্ধারণ করা, চোরাকারবারি, ভুয়া রপ্তানি এবং আমদানি পণ্যের চুরি প্রতিরোধ করাও এই কাস্টম হাউজের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় কাস্টম স্টেশন, যার মাধ্যমে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৫৩ শতাংশ এবং রপ্তানির প্রায় ৭০ শতাংশ শুল্ক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৪৫ শতাংশ এই কাস্টম হাউজ থেকে আয় করে থাকে।[৫] চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে রাজস্ব আদায়ের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৩.৪ হাজার কোটি টাকা হয়েছে।

---

[৪] www.containershipping.com accessed on 28 April 2014.
[৫] http://chc.gov.bd/imp/ accessed on 28 April 2014.

চিত্র ৪: চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (হাজার কোটি টাকা)[৬]

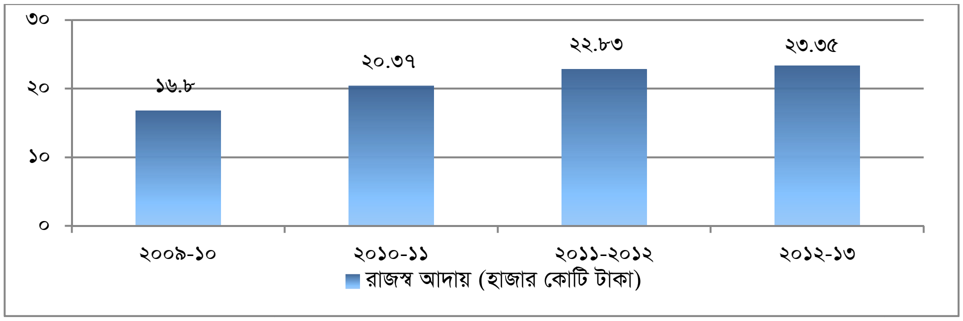

আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে অটোমেশন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। প্রচলিত ম্যানুয়াল ও পেপারবেজড পদ্ধতির পরিবর্তে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাস্টম হাউজে পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া এবং বন্দর হতে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে অটোমেশনের উদ্যোগ প্রথম গৃহীত হয় কাস্টম হাউজের ক্ষেত্রে। ১৯৮০'র দশকে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্স প্রোগ্রাম অব আঙ্কটাড (Technical Assistance Program of UNCTAD) প্রকল্পের অধীনে কাস্টম হাউজের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাস্টম হাউজের কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে অ্যাসাইকুডা (Automated System for Customs Data - ASYCUDA) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে ঢাকা কাস্টম হাউজে এবং ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে অটোমেশনের সূচনা করা হয়। অ্যাসাইকুডা প্রোগ্রামটির বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে ১৯৯৫ সালে প্রোগ্রামটির Ver2 এবং ১৯৯৯ সালে y2k /ver 2.7, ২০০২ সালে অ্যাসাইকুডা++ (v1.16) এবং ২০০৭ সালে অ্যাসাইকুডা++ (v1.18) সংস্করণ প্রচলন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে পরীক্ষামূলকভাবে সফটওয়্যারটির ওয়েব ভিত্তিক নতুন সংস্করণ অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড চালু করা হয়েছে, এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে পুরানো সংস্করণ (অ্যাসাইকুডা++) এর কার্যক্রম বন্ধ করে বর্তমান সংস্করণের মাধ্যমে পণ্য শুল্কায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। তবে ২০১৪ সালের আগের অমীমাংসিত বিল অফ এন্ট্রি ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের বিল অফ এন্ট্রিগুলোর ক্ষেত্রে এখনো অ্যাসাইকুডা++ এর মাধ্যমে শুল্কায়ন সম্পন্ন করা হচ্ছে।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৪ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) আর্থিক সহায়তায় "চিটাগং পোর্ট ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (CPTFP)" গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় বন্দরের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা বা অটোমেশন নিশ্চিত করার জন্য কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CTMS)" নামক প্রকল্পটির বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (CPA) ওপর, এবং প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পায় মার্কিন প্রতিষ্ঠান নাথান এসোসিয়েটস। মার্কিন প্রতিষ্ঠান নেভিসের "স্পার্ক এন-ফোর (Sparcs N4)" সফটওয়্যারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের দায়িত্ব পায় সিঙ্গাপুর টেকনোলজি ইলেক্ট্রনিক্স (STE)। একইসাথে চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটির একবছরের ফ্রি ওয়ারেন্টিসহ পরবর্তী চার বছরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পায় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ডেটাসফট। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নাথান এসোসিয়েটসের সাথে আট কোটি টাকা, প্রকল্পের মূল সরবরাহকারী এসটিই ও নেভিস এর সাথে ৪৩ কোটি টাকা, এবং প্রকল্পটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেটাসফটের সাথে ২০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সম্পূর্ণ সিটিএমএস প্রকল্পের জন্য মোট ৭১ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ২০০৯ সালের ২৮ এপ্রিল সিটিএমএস প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। ২০১০ সালের নভেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তিন দফায় প্রায় ১৫ মাস মেয়াদ বাড়িয়ে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করা হয়। ২০১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ৩০ জুন প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়নসাপেক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সেবা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে গবেষণা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ

[৬] চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, ৩ এপ্রিল, ২০১৪।

কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিআইবি সর্বপ্রথম ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমসের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরূপণ ও এসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি অনুসন্ধানী গবেষণা পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দর এবং ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের ওপর ফলোআপ গবেষণা পরিচালিত হয়। এসব গবেষণার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত অন্যতম সুপারিশ ছিল চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তন করে অনলাইন কার্যক্রম প্রবর্তন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ (মাহমুদ ও রোজেটি, ২০০৭; মাহমুদ ও রোজেটি, ২০০৮)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অটোমেশনের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।[৭]

ধারাবাহিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর এবং কাস্টম হাউজ উভয় প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন চালু করা হয়েছে। কিন্তু গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দরে অটোমেশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে অটোমেশন বাস্তবায়নের পরও চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে পণ্য শুল্কায়নের ক্ষেত্রে পূর্বে প্রচলিত অনিয়ম ও দুর্নীতি অনেকাংশে বিদ্যমান বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।[৮] অটোমেশন বাস্তবায়নের পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে কার্যক্রম পরিচালনায় অটোমেশনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ তুলে ধরার জন্য এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে অটোমেশনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল -

১. চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে অটোমেশন প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা;
২. চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও অনিয়ম চিহ্নিত করা;
৩. চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও অনিয়ম চিহ্নিত করা; এবং
৪. আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে এবং অটোমেশনের কার্যকর বাস্তবায়নে সুপারিশ প্রণয়ন করা

১.৪ গবেষণার আওতা

গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রতিবেদনে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট অটোমেশনের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। অটোমেশনের বিভিন্ন ধাপ, প্রভাব, চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানিকারক বা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের ভূমিকার প্রেক্ষিতে শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও সীমাবদ্ধতা এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আইনি কাঠামো পর্যালোচনা, সার্বিক দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন এই প্রতিবেদনের আওতা-বহির্ভূত।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ ও বন্দরের ওপর গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্সি, অফডক, শিপিং এজেন্সি, ফ্রেইট ফরোয়ার্ড ও মেইনলাইন অপারেটর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য অংশীজনদের

[৭] 'চট্টগ্রাম বন্দর হবে দ. এশিয়ার গেটওয়ে: প্রধানমন্ত্রী', *দৈনিক সমকাল*, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১১।

[৮] 'অনিয়ম দুর্নীতির আখড়া চট্টগ্রাম বন্দর', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ২৯ এপ্রিল ২০১৪; 'অনিয়ম করে শুল্ক ফাঁকি। ১৭ প্রতিষ্ঠানের কাছে কাস্টমসের ২ কোটি ৩৬ লাখ টাকার দাবিনামা', *দৈনিক আজাদি*, ৪ এপ্রিল ২০১৪; 'মূলধনী যন্ত্রপাতির ঘোষণা দিয়ে মদ আমদানি', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জানুয়ারি ২০১৪; 'চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি থেমে নেই', *মানব কণ্ঠ*, ১৩ জানুয়ারি ২০১৩; 'চট্টগ্রাম কাস্টমসের ১৬৩ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ তদন্তে দুদক', *দৈনিক বর্তমান*, ২৫ আগস্ট ২০১৩; 'মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আনা হলো ফটোকপিয়ার ও এলইডি টিভি', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩; 'চট্টগ্রাম কাস্টমসে বিপুল পরিমাণ শুল্ক ফাঁকির ঘটনা উদঘাটন", *দৈনিক ডেসটিনি*, ৩১ মার্চ ২০১০; '৫ কোটি টাকার মোটর পার্টস চট্টগ্রামে আটক: মিথ্যা ঘোষণায় আনা', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৪ জুন ২০১০।

সাথে মোট ৪৭টি মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বন্দর কর্মকর্তা, মেইনলাইন অপারেটর, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও সাংবাদিকদের সাথে আটটি দলীয় আলোচনায় মোট ৫১ জন অংশগ্রহণ করেন।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন ধরনের দাপ্তরিক দলিল, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজের ওপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সাময়িকী এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রম ২০১৪ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাসের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- কর্তৃপক্ষ এবং অংশীজন উভয়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা থাকায় নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের সর্বোচ্চ মাত্রা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।
- প্রতিবেদনে উল্লিখিত নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের তথ্য সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের ওপর ধারণা দিতে সক্ষম।

১.৭ প্রতিবেদনের কাঠামো

প্রতিবেদনটি মোট তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, আওতা, পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে গবেষণার পর্যবেক্ষণে চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া, কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি পণ্য শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার অটোমেশন ও এর ধাপসমূহ, অটোমেশনের ইতিবাচক দিক ও বর্তমান সীমাবদ্ধতা, শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি, বন্দরে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় অটোমেশন ও এর ধাপসমূহ, অটোমেশনের ইতিবাচক দিক ও বর্তমান সীমাবদ্ধতা, পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি, অন্যান্য অংশীজন সংশ্লিষ্ট অনিয়ম আলোচিত হয়েছে। সবশেষে উপসংহার এবং সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া

পণ্য আমদানি-রপ্তানির সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় কাস্টম হাউজে পণ্যের শুল্কায়ন ও বন্দর হতে পণ্য ছাড় বা জাহাজীকরণ গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ধাপ। প্রথমে কাস্টম হাউজে পণ্যের শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর বন্দর থেকে আমদানি পণ্য ছাড় অথবা রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের মাধ্যমে আমদানি বা রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নিম্নের প্রবাহ চিত্রে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কাস্টম হাউজ ও বন্দরের ভূমিকা সংক্ষেপে দেখানো হল।

চিত্র ৫: আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশনের আওতা

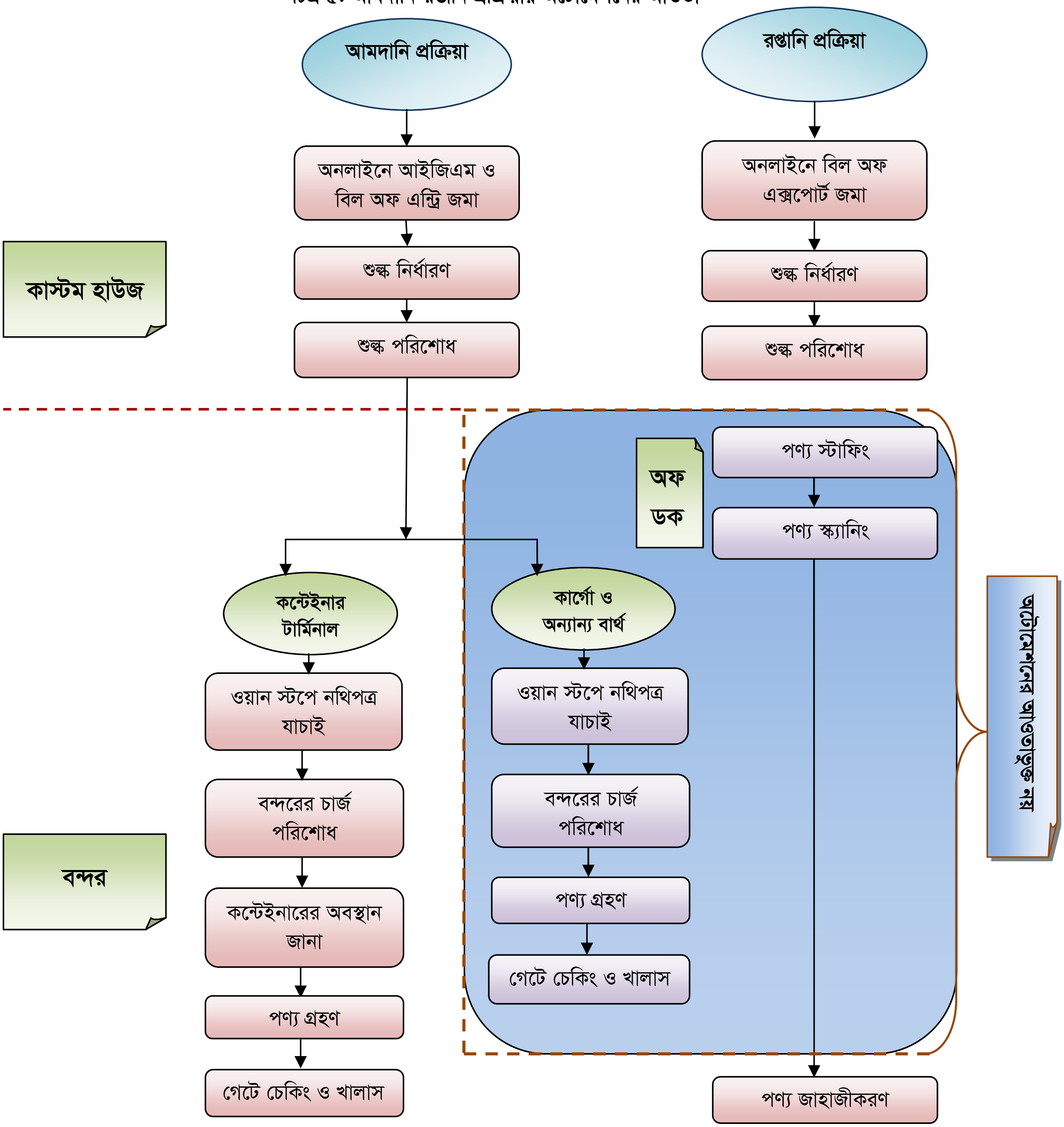

আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে অটোমেশনের আওতায় অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে শুল্কায়ন সম্পন্ন করা হয়। ওয়েব-ভিত্তিক এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইনে আমদানি-রপ্তানি কনসাইনমেন্টের চালান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও অন্যান্য নথিপত্র সরবরাহ এবং যাচাই-সাপেক্ষে ব্যাংকে অনলাইনে শুল্ক পরিশোধ করার মাধ্যমে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনাল এবং জেনারেল কার্গো বার্থ থেকে আমদানি পণ্য ছাড় করার ক্ষেত্রে বন্দরের ওয়ান স্টপ সেকশনে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে ব্যাংকে বন্দরের চার্জ পরিশোধ করতে হয়। তারপর ইয়ার্ড বা শেড থেকে পণ্য ডেলিভারি নিতে হয়। বন্দরের গেটে কাস্টম চেকিং শেষে পণ্য ছাড় করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু বিশেষ পণ্য, যেমন তেল, ক্লিংকার, খাদ্যশস্য আউটার বার্থে খালাস করা হয়। অন্যদিকে রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কাস্টম হাউজে শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর অফ ডকে পণ্য স্টাফিং ও স্ক্যানিং করা হয়। পরবর্তীতে অফ ডক থেকে বন্দরে নিয়ে পণ্য সরাসরি জাহাজীকরণ করা হয়। বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনালের ১৪টি বার্থ অটোমেশনের আওতাভুক্ত হলেও ছয়টি জেনারেল কার্গো বার্থ, বাল্ক পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের জন্য অন্যান্য আরও নয়টি বিশেষায়িত বার্থ ও অফডক এখনো অটোমেশনের আওতার মধ্যে নেই।

২.২ কাস্টম হাউজে পণ্য শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অটোমেশন

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে অটোমেশনের লক্ষ্য হচ্ছে 'পেপারলেস অফিস' প্রতিষ্ঠা করা। এই অটোমেশনের আওতায় মূলত আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধি সিঅ্যান্ডএফ কর্তৃক ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়ারে বিল অফ এন্ট্রির তথ্য সন্নিবেশ, মেইন লাইন অপারেটর (MLO) কর্তৃক ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট (আইজিএম) বা এক্সপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট (ইজিএম) এর তথ্য সন্নিবেশ, পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ (Assesment), অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শুল্ক পরিশোধ এবং শুল্কায়ন সম্পন্ন হলে বন্দরে পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়।

২.২.১ *আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া*

আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া মূলত শিপিং এজেন্ট কর্তৃক অনলাইনে পণ্যের চালান বা আইজিএম দাখিল করার মাধ্যমে শুরু হয়। পরবর্তীতে বিল-অফ-এন্ট্রি ফরমে পণ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সরবরাহ, তথ্য যাচাই-বাছাই, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ শেষে শুল্ক নির্ধারণ এবং শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১) শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার শুরুতে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডের ওয়েব পোর্টালে বিল-অফ-এন্ট্রি (BoE) ফরমের মাধ্যমে পণ্যের চালান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার পর এই বিল-অফ-এন্ট্রির জন্য একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর (C number) তৈরি হয়। তবে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার জাহাজ বার্থিংয়ের ২৪ ঘন্টা পূর্বে হাউজ বিএল (HBL) দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট বিল-অফ-এন্ট্রি 'লক' হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কাস্টম হাউজে নির্ধারিত সেকশন বা হেল্প ডেস্কে একজন ক্লার্ক যাবতীয় নথিপত্র যাচাই করে বিল-অফ-এন্ট্রি 'আনলক' করে। এছাড়া বিল-অফ-এন্ট্রি পূরণে তথ্যগত কোনো ভুল থাকলে সহকারী শুল্ক কর্মকর্তা (এআরও) ও শুল্ক কর্মকর্তা (আরও) কর্তৃক সংশোধন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর (C number) তৈরি হয়।

২) C নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়ার পর, বিল-অফ-এন্ট্রির প্রিন্ট কপি নিয়ে কাস্টম হাউজে পণ্যভেদে সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন গ্রপে[৯] বা সেকশনে এআরও'র কাছে জমা দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে কাস্টম হাউজের নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের[১০] মাধ্যমে মোট চালানের (বিল অফ এন্ট্রি) প্রায় ১৫% নির্বাচিত চালান কায়িক পরীক্ষার জন্য জেটি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কমিশনারের (এডিসি) কাছে পাঠানো হয়। বাকি চালান শুল্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়।

৩) পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ জেটি কাস্টমসের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সম্পূর্ণ পণ্য পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

    ৩.১) অতিরিক্ত কমিশনারের (জেটি) অনুমতিক্রমে সহকারী কমিশনার (AC) নির্বাচিত পণ্যের সংশ্লিষ্ট শেড বা ইয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত এআরও'কে পণ্য পরীক্ষার নির্দেশ দেন।

    ৩.২) সহকারী কমিশনারের উপস্থিতিতে এআরও পণ্য পরীক্ষা করেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কমিশনার (এডিসি), এআইআর (Audit, Investigation & Research) এবং কাস্টম ইনটেলিজেন্স (CI) কর্তৃক পণ্য পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

---

[৯] কাস্টম হাউজে শুল্কায়নের জন্য পণ্যের ধরনভেদে আমদানি পণ্যের জন্য ১৪টি এবং রপ্তানি পণ্যের জন্য ছয়টি ভিন্ন সেকশন বা গ্রুপ নির্ধারণ করা আছে।

[১০] পণ্যের কায়িক পরীক্ষার জন্য কাস্টম হাউজের শুল্কায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে পণ্যের ধরণ, পরিমাণ, মূল্য, আমদানিকারকের পূর্ব ইতিহাস, কান্ট্রি অফ অরিজিন প্রভৃতি বিবেচনা করে তৈরি একটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অনুসরণ করা হয়। এছাড়া ২৯টি নির্দিষ্ট পণ্যের শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করা হয়।

৩.৩) পণ্যের পরীক্ষণ শেষে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের নমুনা বা পণ্যের ছবি সহকারী কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়।

৩.৪) পণ্যের কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে সহকারী কমিশনার অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড-এর সিস্টেমে অনুমোদন দেন।

৩.৫) ফোল্ডার এক্সিট (বন্দর) শাখার মাধ্যমে এই প্রতিবেদনের অনুলিপি কাস্টম হাউজে পাঠানো হয়।

৪) সংশ্লিষ্ট সেকশনের এআরও বিল-অফ-এন্ট্রি ও অন্যান্য নথিপত্রে প্রদত্ত পণ্যের ঘোষণা অনুযায়ী যাচাই শেষে শুল্কায়ন সম্পন্নের উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্মকর্তা'র কাছে পাঠান।

৫) শুল্ক কর্মকর্তা যাবতীয় তথ্য যাচাই-সাপেক্ষে অনলাইনে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়ারে সংশ্লিষ্ট বিল-অফ-এন্ট্রি 'রিলোড' (Reload) করার মাধ্যমে অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ প্রিন্ট করার অনুমতি দেন। তবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের মতানৈক্যের উদ্ভব হলে শুল্ক কর্মকর্তা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাস্টমসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাচাই-বাছাই করে বিল-অফ-এন্ট্রি সংশোধন (Amendment) করার নির্দেশ দেন। নন-কমার্শিয়াল পণ্যের ক্ষেত্রে অনলাইনে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের অ্যাকাউন্ট থেকে শুল্ক পরিশোধ করা হয়। অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ রিলোড হয়ে গেলে উক্ত বিল-অফ-এন্ট্রির ফরমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসিভ (R) নম্বর তৈরি হয়।

৬) শুল্কায়ন সম্পন্ন শেষে 'অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ' প্রিন্ট করে, নোটিশসহ সকল নথিপত্রের অতিরিক্ত তিন সেট তৈরি করা হয়।

৭) অ্যাসেসমেন্ট নোটিশে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ থেকে শুল্ক কর্মকর্তাদের (এআরও, আরও) স্বাক্ষর এবং সিল নেওয়া হয়।

৮) আউটপাস শাখায় ক্লার্কের কাছে সকল নথিপত্রের একটি সেট জমা দেওয়া হয়।

৯) কমার্শিয়াল পণ্যের ক্ষেত্রে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সোনালী ব্যাংক, কাস্টম হাউজ শাখায় নির্ধারিত শুল্ক পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দেন। ব্যাংক কর্মকর্তা সরাসরি অনলাইন সিস্টেমে বিল-অফ-এন্ট্রি ফরমে 'রেড মার্ক' করে দেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অ্যাসেসমেন্ট নোটিশের এক সেট রেখে, অপর দুইটি সেট 'ট্রেজারি স্পিড' শাখায় পাঠান।

১০) 'ট্রেজারি স্পিড' শাখায় কম্পিউটার অপারেটর ব্যাংক ডেলিভারি কাউন্টারের সিল ও স্বাক্ষর নিশ্চিত হয়ে, অ্যাসাইকুডা সিস্টেম থেকে রিসিভ নম্বর (R) বিল-অফ-এন্ট্রিতে লিখে দেন। অ্যাসেসমেন্ট নোটিশের দ্বিতীয় কপি এই সেকশনে রেখে সংশ্লিষ্ট সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের কাছে অ্যাসেসমেন্ট নোটিসের মূল কপি হস্তান্তর করা হয়।

১১) উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় শুল্কায়ন সম্পন্ন করে শিপিং এজেন্টের কাছ থেকে ডেলিভারি অর্ডার নিয়ে বন্দর থেকে পণ্য ছাড় করার কাজ শুরু হয়।

চিত্র ৬: আমদানি পণ্য শুল্কায়ন প্রক্রিয়া

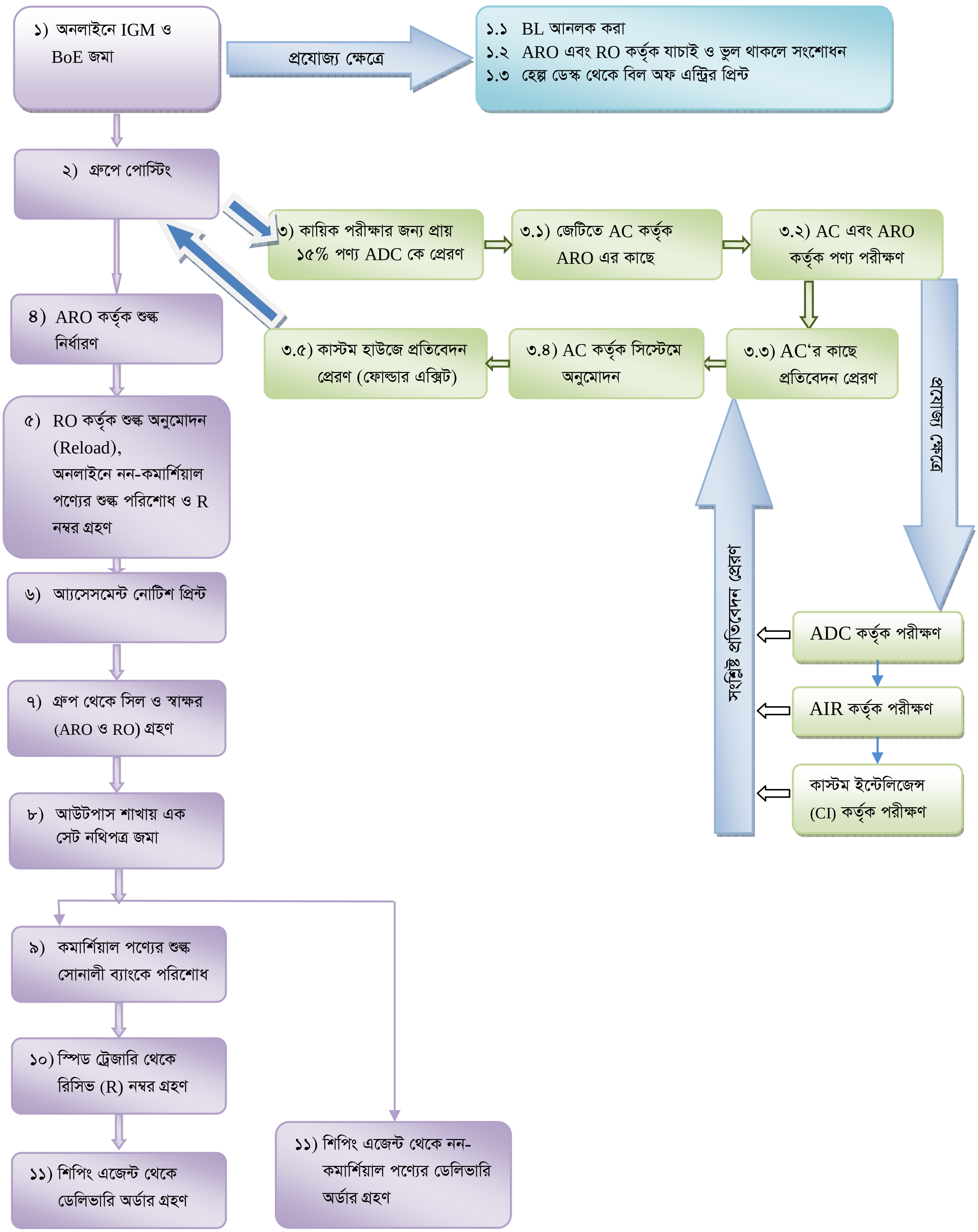

২.২.২ *রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া*

রপ্তানি পণ্য শুল্কমুক্ত হওয়ায় শুল্কায়ন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সংক্ষিপ্ত। তবে শুল্কমুক্ত হলেও রপ্তানি পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ এবং শুল্কায়ন সংক্রান্ত সার্ভিস চার্জ, পণ্য স্ক্যানিং ফি, সিঅ্যান্ডএফ সংক্রান্ত আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে বিল-অফ-এক্সপোর্ট কাস্টম হাউজের সংশ্লিষ্ট গ্রুপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুল্কায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

১. অনলাইনে বিল-অফ-এক্সপোর্ট জমা দেওয়া হয়,
২. সংশ্লিষ্ট গ্রুপে ARO কর্তৃক শুল্ক নির্ধারণ করা হয়,
৩. RO কর্তৃক শুল্ক অনুমোদন (Reload) করা হয়,
৪. নির্ধারিত ট্যারিফ অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়,
৫. পণ্য অফ ডকে আসার পর স্ক্যানিং করা হয়, এবং
৬. রিসিভ (R) নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র শিপিং এজেন্টকে দেওয়া হয়।

চিত্র ৭: পণ্য রপ্তানি প্রক্রিয়ায় শুল্ক কার্যক্রম

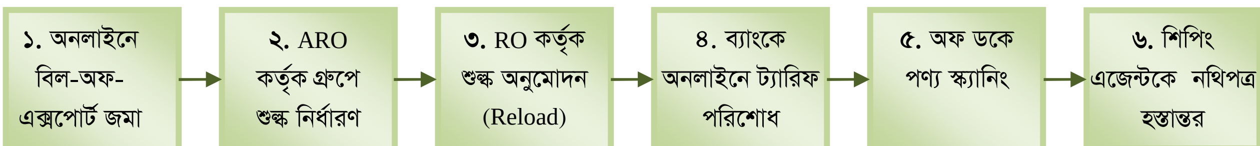

২.২.৩ *শুল্কায়নে ব্যয়িত সময়*

সাধারণত অনলাইনে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে আইজিএম এবং বিল-অফ-এন্ট্রি জমা হওয়ার পর একটি কনসাইনমেন্টের শুল্কায়ন সম্পন্ন করতে গড়ে ন্যূনতম ২৪ ঘন্টা সময় লাগে। তবে জেটিতে পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ করতে হলে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ন্যূনতম দুইদিন প্রয়োজন হয়। পণ্যের কায়িক পরীক্ষায় যদি কোনো অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়, বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান হতে পণ্যের মান যাচাই করাতে হয়, অথবা পণ্যের শুল্ক নির্ধারণে প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা তথ্যে কোনো ধরনের ভুল থাকে, সেক্ষেত্রে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সময় বেশি প্রয়োজন হয়। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কায়িক পরীক্ষা ছাড়া সাধারণ বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে প্রায় ৫১.৩% বিল অফ এন্ট্রি শুল্কায়নে অনধিক একদিন সময় লাগে। অপরদিকে ৮৯.১৩% বন্ড পণ্যের ক্ষেত্রে অনধিক একদিনে বিল অফ এন্ট্রি শুল্কায়িত হয়।

সারণি ১: শুল্ক নির্ধারণে ব্যয়িত সময়

দিন	বিল-অফ-এন্ট্রি (%)	
	সাধারণ পণ্য	বন্ড পণ্য
০ - ১	৫১.৩০	৮৯.১৩
২ - ৩	১৯.৯৮	৫.৬৬
৩ এর অধিক	২৮.৭২	৫.২১

সূত্র: কাস্টম হাউজ, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩

২.২.৪ *শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অটোমেশনের বর্তমান অবস্থা*

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া অনেকাংশে অটোমেশনের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হলেও তার শতভাগ বাস্তবায়ন এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে যে কোনো স্থান থেকে বিল-অফ-এন্ট্রি ফরম পূরণের সুবিধা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল-অফ-এন্ট্রি রেজিস্ট্রেশন, ইত্যাদির মাধ্যমে শুল্কায়ন প্রক্রিয়াটি পূর্বাপেক্ষা সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। তবে অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না।

২.২.৪.১ *শুল্কায়নে অটোমেশনের ইতিবাচক দিক*

১. **যে কোনো স্থান থেকে বিল-অফ-এন্টি ফরম পূরণের সুবিধা:** অব্যবহিত পূর্বের ব্যবহৃত অ্যাসাইকুডা++ সংস্করণে পণ্যের আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় প্রতিটি বিল-অফ-এন্ট্রি ও বিল-অফ-এক্সপোর্ট ফরম পূরণ করা হত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। ফলে নেটওয়ার্কের বাইরের কোনো কম্পিউটার থেকে অ্যাসাইকুডা++ সফটওয়ারে ফরম পূরণ সম্ভব ছিল না। বর্তমানে ওয়েব নির্ভর অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সংস্করণে যে কোনো স্থান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিল-অফ-এন্ট্রি ও বিল-অফ-এক্সপোর্ট ফরমে তথ্য দেওয়ার সুবিধা রয়েছে।

২. **স্বয়ংক্রিয় রেজিস্ট্রেশন:** আমদানি প্রক্রিয়ায় অনলাইনে আইজিএম দাখিলের পর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট বিল-অফ-এন্ট্রি ফরম পূরণ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত ফরমে রেজিস্ট্রেশন নম্বর জেনারেট হয়। পূর্বে কাস্টম হাউজের নোটিং সেকশন হতে এই রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করতে হতো।

৩. **স্বয়ংক্রিয় শুল্ক নির্ধারণ:** আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষার প্রয়োজন না হলে, অনলাইনে বিল-অফ-এন্ট্রি ফরম পূরণ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের এইচএস (HS) কোড অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ হয়ে যায় এবং শুল্কের পরিমাণ বিল-অফ-এন্ট্রি ফরমে সরাসরি চলে আসে। অনুরূপভাবে রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রেও বিল-অফ-এক্সপোর্ট ফরম পূরণ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের ধরন ও মূল্য অনুসারে শুল্কায়ন সংক্রান্ত সার্ভিস চার্জ, সিঅ্যান্ডএফ সংশ্লিষ্ট আয়কর ও ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ হয়ে যায়। পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অনলাইনে সকল নথিপত্র ও তথ্য যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. **অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শুল্ক পরিশোধ:** শুল্ক কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে (রিলোড) আমদানিকৃত নন-কমার্শিয়াল বা বন্ডেড পণ্যের শুল্ক নির্ধারিত হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট বা আমদানিকারকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নির্ধারিত শুল্ক পরিশোধ হয়ে যায়। একইভাবে রপ্তানি পণ্যের জন্য শুল্কায়ন সংক্রান্ত সার্ভিজ চার্জ ও অন্যান্য ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকে।

৫. **তথ্য ফাঁকি নিয়ন্ত্রণ:** বর্তমানে পণ্যের চালানে (IGM) কোন সংশোধনী থাকলে পূর্বের ন্যায় ম্যানুয়াল সিস্টেমে তা সংশোধন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সংশোধনীর ধরন অনুসারে সহকারী কমিশনার বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ ও নির্ধারিত চার্জ (১০০০ টাকা) পরিশোধ করার পর, সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তা (আরও, এআরও) অনলাইনে তা সংশোধন করে দেন। ফলে এসংক্রান্ত জাল নথিপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। বিল-অফ-এন্ট্রির তথ্য হালনাগাদের প্রেক্ষিতে বন্দরের বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পণ্য সম্পর্কিত কায়িক তথ্য ও পণ্যের শুল্ক পরিশোধের তথ্য সরাসরি সিস্টেমে দেখতে পারে, যা বন্দর থেকে পণ্য খালাসের সময় উক্ত কনসাইনমেন্ট সম্পর্কিত নথিপত্রের তথ্য যাচাই করতে সহায়তা করে।

২.২.৪.২ *শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অটোমেশনের বর্তমান সীমাবদ্ধতা*

১. **অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া:** বর্তমানে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে শুল্কায়নের পুরো প্রক্রিয়াটি কাগজবিহীন এবং সম্পূর্ণ অনলাইনে পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। অটোমেশন চালুর পরও পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট বা আমদানিকারকের প্রতিনিধিকে কাস্টম হাউজে যেতে হচ্ছে, শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে অনলাইনে তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি বিভিন্ন নথিপত্রের হার্ড কপি জমা দিতে হচ্ছে, এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনে শুল্ক কর্মকর্তাদের সিল ও স্বাক্ষর নিতে হচ্ছে। যেসব ক্ষেত্রে এখনো অটোমেশন সম্পূর্ণ হয়নি তার মধ্যে রয়েছে:

- ***ইজিএম নিবন্ধন:*** আমদানি পণ্যের শুল্কায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আইজিএম নিবন্ধন নিশ্চিত করা গেলেও রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টি সময়ে ইজিএম নিবন্ধন নিশ্চিত করা যায়নি। বিভিন্নধরনের অবকাঠামোগত সুবিধার অনুপস্থিতি, গ্যাস ও বিদ্যুতের অপ্রতুল সরবরাহ এবং সর্বোপরি অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পণ্যের উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় 'কাট অফ টাইম' অনুযায়ী জাহাজীকরণের জন্য পণ্যভর্তি কন্টেইনার বন্দরে পাঠানো সম্ভব হয় না।
- ***বন্ড পণ্য ট্র্যাকিং মডিউল:*** বন্ড পণ্যের ক্ষেত্রে ট্র্যাকিং মডিউল এখনো প্রবর্তন করা হয়নি, যা বাস্তবায়িত হলে বন্ড পণ্য আমদানির পরিমাণ, পণ্যের ব্যবহার, বন্ড পণ্য থেকে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ, এবং অব্যবহৃত বন্ড পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কে যথাযথ ট্র্যাকিং করা সম্ভব হবে। ফলে শূন্য শুল্কে বন্ডেড পণ্য আমদানির পর শতভাগ পণ্য রপ্তানি না করে জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।
- ***কায়িক পরীক্ষণ:*** চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে আমদানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের জন্য কোনো ধরনের অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু হয়নি। বর্তমান অটোমেশন ব্যবস্থায় এ সংক্রান্ত কোনো মডিউলও (Valuation Module/ Examine Module) তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়নি। পণ্য পরীক্ষণের সাথে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ পণ্যের ধরন বা মান যাচাই, অথবা অধিকতর পরীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক পরীক্ষাগার, বুয়েট, বিএসটিআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে এখনো অটোমেশনের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। জেটিতে পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচিত বিল-অফ-এন্ট্রি জেটিতে প্রেরণ, পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ, এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে কাস্টম হাউজে প্রেরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের নমুনা প্রাপ্তি -

সকল কার্যক্রম এখনো ম্যানুয়ালি সম্পন্ন করতে হয়। পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ শেষে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনও ফোল্ডার এক্সিট শাখার মাধ্যমে ম্যানুয়ালি কাস্টম হাউজে প্রেরণ করা হয়।

২. **অনলাইন রেজিস্ট্রেশনে সীমাবদ্ধতা:** ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাউজ বিএল (HBL) জমা না দেওয়ার কারণে বিল-অফ-এন্ট্রি 'লক' করা থাকলে কাস্টম হাউজে নির্ধারিত সেকশন থেকে তা 'আনলক' করাতে হয়। এক্ষেত্রে সকল কাজ ম্যানুয়ালি করতে হয়, অনলাইনে নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে বিএল হালনাগাদ করার সুযোগ নেই। বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশ বিল-অফ-এন্ট্রি 'লক' করা থাকে।

৩. **শুল্ক পরিশোধে অটোমেশনের সীমাবদ্ধতা:** বর্তমানে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সাহায্যে নন-কমার্শিয়াল বা বন্ডেড পণ্য এবং রপ্তানি পণ্যের শুল্ক পরিশোধ করা হলেও, কমার্শিয়াল পণ্যের শুল্ক পরিশোধ চালু হয়নি। এক্ষেত্রে এখনো আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে সশরীরে ব্যাংকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রেও শুল্ক পরিশোধের পর স্পিড ট্রেজারি শাখার কর্মকর্তা অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট বিল-অফ-এন্ট্রি চিহ্নিত (রেডমার্ক) করে দেন। এছাড়া সার্বিক অটোমেশন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি ব্যাংকসমূহ ও বাংলাদেশ ব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এলসি (Letter of Credit) সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা ও সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪. **অটোমেশন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা:** অটোমেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে, শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা সমপর্যায়ের নয়। কাস্টম হাউজ অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন, যারা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পরও সমপর্যায়ের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হননি। কাস্টম হাউজে সনাতনী শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার অব্যহত চর্চা, নতুন পদ্ধতিতে শুল্কায়নে অভ্যস্ততা তৈরির ক্ষেত্রে কাস্টম হাউজের অংশীজনদের অনাগ্রহ, সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজন কার্যালয়গুলোকে এই সমন্বিত প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত লজিস্টিকসের অপ্রতুলতা অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে।

২.২.৫ *পণ্য শুল্কায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি*

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে ১৯৯৫ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন বাস্তবায়নের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বর্তমানে ওয়েবভিত্তিক অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড চালু করা হলেও পূর্ণাঙ্গ অনলাইন শুল্কায়ন অথবা অংশীজনদের অনুপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ শুল্কায়ন এখনো নিশ্চিত হয়নি। পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত সকল কাজ অনলাইনে করা হলেও এখনো শুল্ক নির্ধারণী বা অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ প্রিন্ট করতে হয়। অনলাইনে বিভিন্ন স্তরে আমদানি-রপ্তানি পণ্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি, বিভিন্ন নথিপত্রের হার্ডকপি জমা দিতে হয়। কাস্টম হাউজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতে, অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ প্রিন্ট করা বা এই নোটিশে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর ও সিল সংগ্রহের বৈধতা এবং প্রয়োজনীয়তা নেই।

বাস্তবে সকল অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ প্রিন্ট করে, তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর ও সিল সংগ্রহ করতে হয় এবং তার এক কপি কাস্টম হাউজের আউটপাস শাখায় জমা দিতে হয়। অটোমেশন-পূর্ববর্তী সময়ের মত এখনো শুল্কায়নের বিভিন্ন স্তরে আমদানি-রপ্তানিকারক বা তাদের প্রতিনিধি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ রয়েছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিয়ম-বহির্ভূতভাবে 'আন্ডার টেবিল মানি' বা অবৈধ অর্থ দেওয়ার রীতি এখনো বিদ্যমান। আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কায়িক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ন্যূনতম যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয় তার একটি সাধারণ চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।

সারণি ২: আমদানি পণ্যের শুল্কায়নে নিয়ম-বহির্ভূত ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র

ধাপ	আদায়কারী ব্যক্তি	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১. বিএল লক (প্রায় ৫০%) থাকায়, সংশ্লিষ্ট সেকশনে আনলক করা	ক্লার্ক	১০০
২. এআরও কর্তৃক শুল্ক নির্ধারণ	এআরও	১,০০০
৩. আরও কর্তৃক শুল্ক নির্ধারণী নোটিশ প্রদান *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর)*	আরও	১,০০০
৪. অ্যাসেসমেন্ট নোটিসের প্রিন্ট কপিতে এআরও এবং আরও কর্তৃক স্বাক্ষর এবং সিল নেওয়া	পিয়ন	১০০
৫. গ্রুপ ক্লার্কের কাছে অ্যাসেসমেন্ট নোটিশসহ সকল নথিপত্র জমা দেওয়া	গ্রুপ ক্লার্ক	৬০০
৬. ব্যাংকে শুল্ক পরিশোধ	পিয়ন	১০০
৭. স্পিড ট্রেজারি থেকে রিসিভ (R) নম্বর গ্রহণ	ক্লার্ক	১০০
মোট		**৩,০০০**

বর্তমানে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে কমার্শিয়াল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে একটি কনসাইনমেন্টের প্রযোজনীয় সকল কাগজপত্র এবং প্রদত্ত তথ্য সঠিক থাকলেও শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ন্যূনতম ৩,০০০ টাকা দিতে হয় (সারণি ২)। তবে কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম অর্থের পরিমাণ আরও বেশি হয়ে থাকে, যেমন মোটর পার্টস ও ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা, টাইলসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা দিতে হয়। তবে শুল্ক মুক্ত নন-কমার্শিয়াল ও জেনারেল বন্ড পণ্যের শুল্কায়নের জন্য কনসাইনমেন্ট প্রতি গড়ে ন্যূনতম ১,৩০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে আমদানিকারক বা ব্যবসায়ী মূলত হয়রানি এড়াতে বা অযথা সময়ক্ষেপণ হতে রেহাই পেতে এই অর্থ দিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ দুর্নীতির (Coercive Corruption) শিকার হয়।

অন্যদিকে, অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারক বা ব্যবসায়ী শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে জাল নথি সরবরাহ, অথবা তথ্য গোপন বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তার সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তাদেরকে প্রদত্ত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ আমদানিকৃত পণ্যের সম্ভাব্য শুল্ক ফাঁকির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এ ধরনের শুল্ক ফাঁকির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও শুল্ক কর্মকর্তা উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে সমঝোতামূলক দুর্নীতিতে (Collusive Corruption) জড়িয়ে পড়ে।

আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে কাস্টম হাউজের নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে মোট কনসাইনমেন্ট সংখ্যার ১৫% এবং ২৯ ধরনের নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে ১০০% কায়িক পরীক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। জেটিতে কমার্শিয়াল পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের জন্য কন্টেইনার প্রতি গড়ে ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয় (সারণি ৩)। এক্ষেত্রেও আমদানিকারক কোনো জাল নথিপত্র বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ অথবা তথ্য গোপন না করলেও উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ আদায় করা হয়।

সারণি ৩: কায়িক পরীক্ষণে নিয়ম-বহির্ভূত ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র (কমার্শিয়াল)

ধাপ	আদায়কারী ব্যক্তি	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১. ইয়ার্ডে পোস্টিং	পিয়ন	১০০
২. পণ্য পরীক্ষণ	এআরও	১,০০০
৩. পণ্য পরীক্ষণ	সহকারী কমিশনার	২,০০০
৪. নমুনা সংরক্ষণ	জেটি ক্লার্ক	৩০০
৫. প্রতিবেদন গ্রুপে জমা নেওয়া	ক্লার্ক ও পিয়ন	৩০০
৬. নমুনা কাস্টম হাউজে জমা রাখা	ক্লার্ক	৩০০
ন্যূনতম সর্বমোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ		**৪,০০০**
৭. পণ্য পরীক্ষণ	অতিরিক্ত কমিশনার	২,০০০*
৮. পণ্য পরীক্ষণ	এআইআর	২,০০০*
৯. পণ্য পরীক্ষণ	শুল্ক গোয়েন্দা	৫,০০০*
** কোনো কনসাইনমেন্ট সম্পর্কে বিশেষ তথ্য থাকলে বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সন্দেহ হলে তাদের নিজস্ব ক্ষমতাবলে তারাও সেই পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করে থাকে।*		

পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের বিভিন্ন স্তরে উপরেল্লিখিত ন্যূনতম নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ছাড়াও আমদানিকারক ও শুল্ক কর্মকর্তা উভয়ের যোগসাজশে বিভিন্ন উপায়ে শুল্ক ফাঁকির ঘটনাতেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে আমদানিকারক পণ্যের ধরন, ওজন ও মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা ঘোষণা, এইচএস কোড পরিবর্তন এবং জাল নথি উপস্থাপন করে। শুল্ক কর্মকর্তা পণ্যের যথাযথ পরীক্ষণ ও নথিপত্র যাচাই ছাড়াই কায়িক পরীক্ষণ সংক্রান্ত মিথ্যা প্রতিবেদন তৈরি করে দেন। উভয়পক্ষের যোগসাজশে এ ধরনের মিথ্যা প্রতিবেদন তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তাদেরকে দেওয়া ঘুষের পরিমাণ সম্ভাব্য শুল্ক ফাঁকির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।

সারণি ৪: রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়নে নিয়ম-বহির্ভূত ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র

ধাপ	আদায়কারী ব্যক্তি	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১. পণ্য অ্যাসেসমেন্ট (কাস্টম হাউজ)	এআরও ও আরও	৩০০
২. পণ্য স্ক্যানিং ও রিলিজ অর্ডার (অফ ডক)	এআরও	২০০
মোট		**৫০০**

শুল্কমুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সহজ। শুল্ক ফাঁকির সুযোগ না থাকায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের সুযোগ কম। সাধারণত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন ধাপে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়

করা হয়। কাস্টম হাউজে বিল-অফ-এক্সপোর্টে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে প্রাইভেট ডিপো বা অফ ডক হতে কন্টেইনারে পণ্য লোডিংয়ের পূর্বে পণ্য স্ক্যানিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তাদেরকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। এক্ষেত্রে অর্থ না দিলে বা দিতে অনীহা প্রকাশ করলে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই বাছাইয়ের নামে হয়রানি ও সময়ক্ষেপণ করা হয়। আমদানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কাস্টম হাউজের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নমুনা পরিবহণ সময়সাপেক্ষ হওয়ায় সাধারণত আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধি নিজে গাড়ি ভাড়া বাবদ ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিয়ে নমুনা পরিবহণের ব্যবস্থা করে (সারণি ৪)। পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ প্রিন্ট হয়ে যাওয়ার পর কোনো সংশোধন করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোল্ডার জমা দিতে কমিশনারের পিওনকে ন্যূনতম ৫০০ - ১,০০০ টাকা দিতে হয়।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানিকারক ও শুল্ক কর্মকর্তা-কর্মচারী, উভয়পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে সরকার প্রতিদিন মোট কত টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কী পরিমাণ ঘুষ আদায় করা হচ্ছে সে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। তবে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় শুল্ক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অলিখিত নিয়ম হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিদিন ন্যূনতম যে পরিমাণ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করছে, নিম্নে তার একটি প্রাক্কলিত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে (সারণি ৫)।

সারণি ৫: চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে দৈনিক ন্যূনতম নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ (প্রাক্কলিত)[১১]

	ধরন	অর্থের পরিমাণ (ইউনিট প্রতি টাকা)	গড় সংখ্যা	অর্থের মোট পরিমাণ (টাকা)
আমদানি প্রক্রিয়া	কমার্শিয়াল পণ্য (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	৩,০০০	৫৫০ টি	১৬.৫ লক্ষ
	নন-কমার্শিয়াল বা বন্ডের পণ্য (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	১,৩০০	৬০০ টি	৭.৮ লক্ষ
	কায়িক পরীক্ষণ (প্রতি কন্টেইনার)	৪,০০০	৩০৫ টি	১২.২ লক্ষ
আমদানি প্রক্রিয়ায় দৈনিক ন্যূনতম নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মোট পরিমাণ				**৩৬.৫ লক্ষ**
রপ্তানি প্রক্রিয়া	কাস্টম হাউজে অ্যাসেসমেন্ট (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	৩০০	২২০০ টি	৬.৬ লক্ষ
	ডিপোতে পণ্য পরীক্ষণ (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	২০০	২২০০ টি	৪.৪ লক্ষ
রপ্তানি প্রক্রিয়ায় দৈনিক ন্যূনতম নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মোট পরিমাণ				**১১ লক্ষ**
আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় দৈনিক ন্যূনতম নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মোট পরিমাণ				**৪৭.৫ লক্ষ**

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলন অনুযায়ী, কাস্টম হাউজে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দৈনিক ন্যূনতম প্রায় ৩৬.৫ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দৈনিক ন্যূনতম প্রায় **১১** লক্ষ টাকা, ন্যূনতম মোট ৪৭.৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। তবে তথ্যদাতাদের মতে সমঝোতামূলক দুর্নীতির (Collusive Corruption) মাধ্যমে আদায়কৃত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ উল্লিখিত প্রাক্কলিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি।

আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আমদানিকারকের মধ্যে অনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে দালাল বা সহয়তাকারী হিসেবে কাজ করে কাস্টম হাউজে অবৈধভাবে শুল্ক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহয়তাকারী হিসেবে কর্মরত কিছু ব্যক্তি যারা 'ফালতু' বা 'বদি আলম' নামে পরিচিত। বর্তমানে কাস্টম হাউজে অনুমোদিত জনবলের মোট পদের বিপরীতে গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। বিশেষ করে **১৯৮২** সালের পর থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদে নিয়োগ বন্ধ থাকায় বর্তমানে অনুমোদিত পদসংখ্যার বিপরীতে এপ্রাইজার বা ইন্সপেক্টর পদে প্রায় ৬১ শতাংশ, সিপাই পদে প্রায় ৮২ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। জনবলের এই অপ্রতুলতার সুযোগে শুল্ক কর্মকর্তাগণ সম্পূর্ণ নিজস্ব

[১১] চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমদানিকৃত কমার্শিয়াল পণ্যের কনসাইনমেন্ট সংখ্যা ছিল ১,৪৪,৩৭৯, বন্ডের পণ্যের কনসাইনমেন্ট সংখ্যা ১,৫৭,৯৬৩ এবং রপ্তানি পণ্যের কনসাইনমেন্ট সংখ্যা ৫,৯৪,৩০৯। কায়িক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কনসাইনমেন্টের পরিবর্তে কন্টেইনারের সংখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাক্কলণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমদানিকৃত পণ্যের কন্টেইনার সংখ্যা ছিল ৭,৪৩,৫৪৭ টিইইউস। তবে এক্ষেত্রে বাল্ক কার্গো পণ্যের অনুপাত বা সংখ্যা পাওয়া যায়নি, তাই বাল্ক কার্গোর পরীক্ষণে দেওয়া নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলন সম্ভব হয়নি।

উদ্যোগে তাদের ব্যক্তিগত সহায়তাকারী হিসেবে অবৈধভাবে নিয়োগ দেন। সাধারণত প্রতিটি গ্রুপে ন্যূনতম একজন "ফালতু" বা "বদি আলম" নামে এ ধরনের ব্যক্তিগত সহকারী কাজ করে। এমনকি জেটিতে পণ্যের পরীক্ষণের জন্য প্রতিটি শেড ও ইয়ার্ডে কর্মরত শুল্ক কর্মকর্তাদের সাথেও নিজস্ব সহকারী কাজ করে। সাধারণত দৈনিক মাসোহারার ভিত্তিতে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পণ্যের শুল্কায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন নথিপত্রের ফাইল গ্রহণ ও নিবন্ধন, নির্দিষ্ট এইচএস কোডের প্রেক্ষিতে শুল্ক নির্ধারণ, বিভিন্ন প্রয়োজনে সংরক্ষিত নথি খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা করা তাদের প্রধান কাজ। তবে তারা পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় আমদানিকারক বা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তাদের মধ্যে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক চুক্তি বা অনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অনেক গ্রুপে শুল্ক কর্মকর্তার কম্পিউটারের ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড তার নিয়োজিত 'ফালতু' বা সহকারীর জানা থাকে। এসব 'ফালতু' চট্টগ্রামের স্থানীয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুল্ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়। শুল্ক কর্মকর্তাদের সরকারি চাকরির নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলি হলেও এদের কখনো বদলি হয় না। ফলে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতায় অনেক ক্ষেত্রে তারা সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তা অপেক্ষা অধিক দক্ষ হয়ে থাকে। এদের ওপর কর্মকর্তাদের নির্ভরশীলতা এতটাই বেশি যে ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থায় এদেরকে কাস্টম হাউজ থেকে বের করে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তাদের অনেককেই তৎকালীন কর্তৃপক্ষ ফিরে আসার সুযোগ দিতে বাধ্য হয়।

২.৩ বন্দরে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় অটোমেশন

বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন-নির্গমন, বার্থিং এবং জাহাজ হতে পণ্য লোডিং-আনলোডিংয়ের সুবিধা দেওয়া চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়াার পূর্ব পর্যন্ত পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্বও বন্দর কর্তৃপক্ষ পালন করে থাকে। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর শুরু হয় বন্দর হতে পণ্য ছাড়ের প্রক্রিয়া। রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কাস্টম হাউজ হতে পণ্যের অ্যাসেসমেন্ট শেষে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ট্যারিফ পরিশোধের পর শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ছাড়পত্র পাওয়া সাপেক্ষে পণ্য জাহাজে লোডিংয়ের জন্য বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

২০০৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দ্রুত ও যথার্থ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে অটোমেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের জেনারেল কার্গো বার্থের ৬টি, সিসিটিতে ৩টি এবং এনসিটিতে ৫টি, মোট ১৪টি টার্মিনালে বর্তমানে কন্টেইনারবাহী ফিডার জাহাজের বার্থিং করা হয়। তবে প্রয়োজনে জিসিবির অন্যান্য টার্মিনালেও কন্টেইনারবাহী জাহাজ বার্থিং করা হয়ে থাকে। ২০১৩ সালের জুন মাসে অটোমেশনের দায়িত্ব চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গ্রহণের মাধ্যমে কন্টেইনার টার্মিনালসমূহকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়। তবে কন্টেইনার টার্মিনালগুলোতে অটোমশেনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাল্ক কার্গো টার্মিনালের বা বাল্ক কার্গোতে আমদানিকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা এই অটোমেশনের আওতা-বহির্ভূত। নিম্নে বন্দর হতে কন্টেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের ছাড় বা খালাস প্রক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

২.৩.১ *বন্দর থেকে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া*

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে পণ্য শুল্কায়ন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর শিপিং এজেন্টের কাছ থেকে ডেলিভারি অর্ডার নিয়ে বন্দরের ওয়ান স্টপ সেকশনে (One Stop Section) আমদানি পণ্য সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া শুরু হয়। একইসাথে টার্মিনাল ভবন থেকে কন্টেইনারের অবস্থান জেনে নিতে হয়। ওয়ান স্টপ সেকশনে মূলত পণ্যের আইজিএম যাচাই, বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় বিল তৈরি, বিল পরিশোধ এবং বিল পরিশোধ সংক্রান্ত এন্ডোর্সমেন্ট (Endorsement) করাতে হয়।

সাধারণত দুই ধরনের কন্টেইনারের মাধ্যমে পণ্য আমদানি করা হয়, যা এফসিএল (FCL- Full Container Load) ও এলসিএল (LCL- Less Container Load) কন্টেইনার নামে পরিচিত। এই দুই ধরনের কন্টেইনারের পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। আবার এফসিএল কন্টেইনারের পণ্য খালাসের ক্ষেত্রেও ধরনভেদে প্রক্রিয়ার ভিন্নতা রয়েছে। এফসিএল পণ্য কন্টেইনার থেকে ইয়ার্ডে খালাস করে পুনরায় ট্রাক বা লরির মাধ্যমে বন্দর হতে ডেলিভারি নেওয়া হয়। এছাড়া ট্রেইলারের মাধ্যমে বন্দর থেকে কন্টেইনারসহ পণ্য ডেলিভারি নেওয়া যেতে পারে, যাকে অন-চেসিস (On Chasis) ডেলিভারি বলা হয়ে থাকে। এফসিএল কন্টেইনারের পণ্য ছাড়ের জন্য কন্টেইনার ইনডেন্ট (Indent) দিতে হলেও এলসিএল কন্টেইনারের ক্ষেত্রে তা দিতে হয় না। এছাড়া এফসিএল কন্টেইনার খোলার জন্য সিকিউরিটির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রিভিটরকে (Revetor) দিয়ে কন্টেইনার খোলাতে হয়, যা এলসিএল কন্টেইনারের পণ্যের জন্য প্রয়োজন হয় না। এফসিএল কন্টেইনারসমূহ বন্দরের ইয়ার্ডে নির্দিষ্ট প্লান অনুযায়ী স্টক করা থাকে। অন্যদিকে এলসিএল কন্টেইনারসমূহের পণ্য কন্টেইনার হতে খালাস করে বন্দরের নির্দিষ্ট শেডসমূহে সংরক্ষণ করা হয়।

সাধারণত এফসিএল কন্টেইনারের পণ্য খালাসের আগের দিন বন্দরের ওয়ান স্টপ সেকশনের আনুষ্ঠানিকতা ও বিল পরিশোধ সম্পন্ন করে পণ্যের জন্য ইনডেন্ট (Indent) বা চাহিদা জানিয়ে রাখতে হয়। তবে নির্দিষ্ট সময়ে ইনডেন্ট না দেওয়া হলে, অথবা জরুরি প্রয়োজনে অ্যাসিসট্যান্ট টার্মিনাল ম্যানেজার (ATM) বা টার্মিনাল ম্যানেজারের (TM) বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে একইদিনে ইয়ার্ড

থেকে পণ্য ডেলিভারি নেওয়া যেতে পারে। পণ্যের শুল্কায়ন শেষে সাধারণত বন্দর থেকে পণ্য খালাসে এলসিএল পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম একদিন এবং এফসিএল পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুইদিন সময় প্রয়োজন হয়।

বন্দরে সিটিএমএস'র (CTMS) মাধ্যমে যে অটোমেশন প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করা হয়েছে তার মাধ্যমে আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট বন্দরে কন্টেইনারটি কোন জেটি বা ইয়ার্ডে আছে তা জানতে পারে। এছাড়া পণ্যের শুল্কায়ন শেষে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড হতে সিটিএমএস সিস্টেমে ই-মেইলের মাধ্যমে পণ্যের শুল্কায়ন সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা হয়। ফলে বন্দরে আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক দাখিলকৃত পণ্যের শুল্কায়ন সম্পর্কিত নথিপত্র সহজে যাচাই করা সম্ভব হয়।

বন্দর হতে পণ্য ছাড় বা খালাস প্রক্রিয়ায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জিসিবিতে ছয়টি বার্থ অপারেটর এবং সিসিটি ও এনসিটিতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টার্মিনাল অপারেটর হিসেবে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করে। এসব বেসরকারি বার্থ অপারেটর ও টার্মিনাল অপারেটর জাহাজ থেকে পণ্য নির্দিষ্ট শেড বা ইয়ার্ডে পরিবহণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। পরবর্তীতে এদের নিয়োগকৃত শ্রমিক নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এলসিএল বা এফসিএল পণ্য কন্টেইনার হতে খালাস করে আমদানিকারকের চাহিদামত পরিবহনে লোড করে।

পণ্য ছাড় পর্যায়ে বিল-অফ-এন্ট্রিতে প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যে কোনো মার্ক বা চিহ্ন না থাকলে তা "নিল মার্ক (Nil mark)" এবং পণ্যে ভিন্ন কোনো মার্ক বা চিহ্ন থাকলে তা "রং মার্ক (Wrong mark)" হিসেবে পরিগণিত হয়। এছাড়া বিল-অফ-এন্ট্রিতে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী পণ্যের নির্দিষ্ট মাপ বা ধরনের প্যাকিং এর পরিবর্তে ভিন্ন মাপ বা ধরনের প্যাকিং পাওয়া গেলে তা "ব্রেকিং (Breaking)" করে বিল-অফ-এন্ট্রিতে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী প্যাকিংয়ে পরিবর্তন করার পর পণ্য ছাড় করতে হয়। এই ধরনের নিল মার্ক বা রং মার্ক সংশোধন এবং ব্রেকিং এর জন্য পৃথকভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট বার্থ অপারেটর ও শিপিং এজেন্টের কাছ থেকে অনাপত্তি পত্র সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট চেকার ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে টার্মিনাল ম্যানেজারের কাছ থেকে পণ্য ছাড়ের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় সাধারণত এলসিএল পণ্যের জন্য ১৬টি ধাপ, এফসিএল পণ্যের জন্য ১৯টি ধাপ এবং এফসিএল পণ্যের অন-চেসিস ডেলিভারির ক্ষেত্রেও ১৯টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। অন-চেসিস ডেলিভারির জন্য পণ্যের ইনডেন্ট দেওয়ার পূর্বে টার্মিনাল ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি (On Chasis Permission) নিতে হয়। অন-চেসিস ডেলিভারির কন্টেইনার সাধারণত বন্দরে কোনো ইয়ার্ডে আনস্টাফিং বা পরীক্ষা করা হয় না - কন্টেইনার সরাসরি আমদানিকারক কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কন্টেইনার বন্দর হতে বের হওয়ার পূর্বে গেটে স্ক্যান করা হয়। নিম্নে বন্দর হতে এলসিএল, এফসিএল ও অন-চেসিস পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার একটি প্রবাহ চিত্র দেওয়া হল।

চিত্র ৩: বন্দরে আমদানি পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া

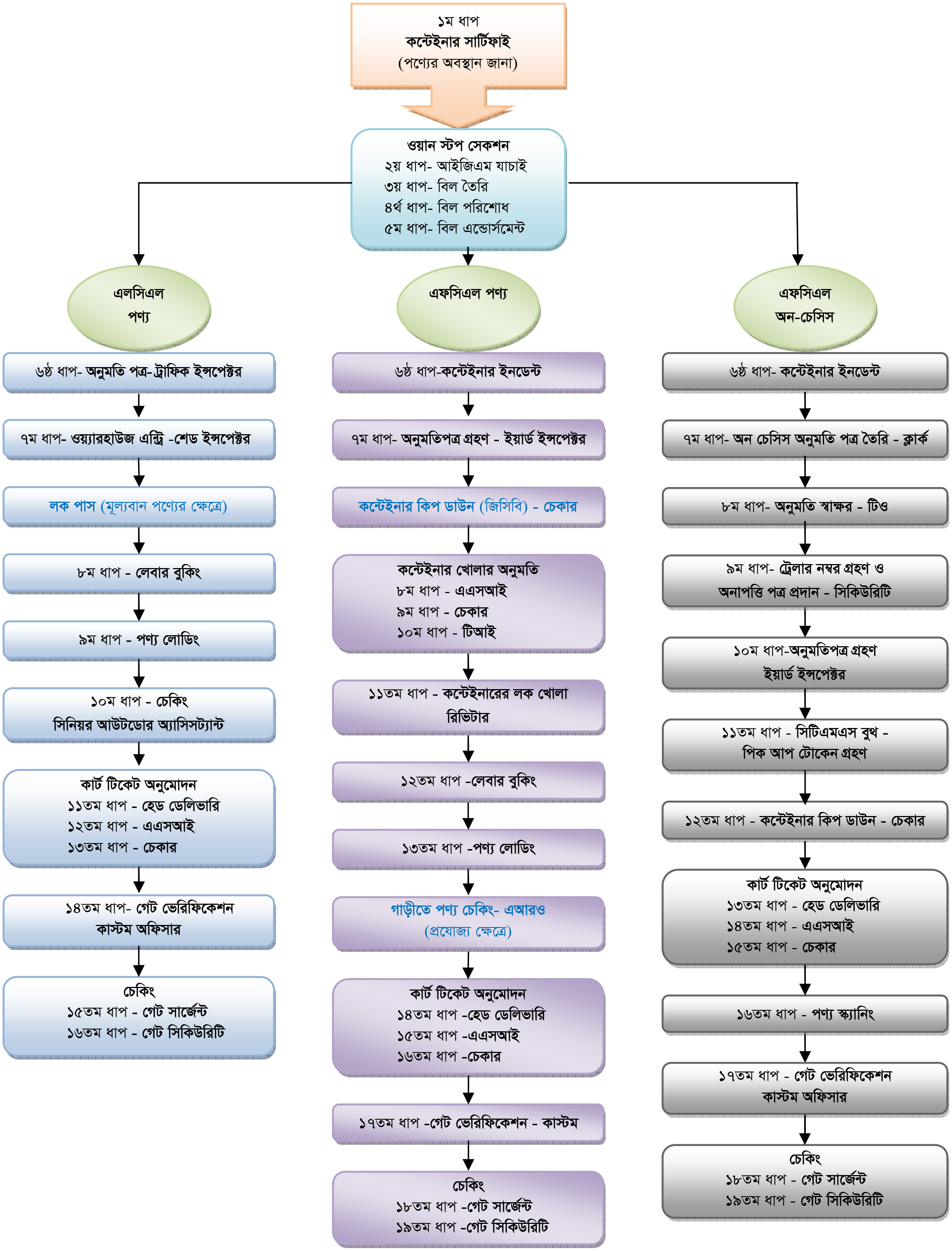

২.৩.২ *বন্দরে অটোমেশনের বর্তমান অবস্থা*

বন্দরে অটোমেশন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্দরের কন্টেইনার জেটি বা টার্মিনালগুলোর মাধ্যমে কন্টেইনারের কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ বন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন এবং বার্থিং বরাদ্দ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা। অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্দরে জাহাজ থেকে লোডিং-আনলোডিং প্রক্রিয়া, ইয়ার্ডে কন্টেইনার স্থানান্তর, ট্র্যাকিং ও ডেলিভারি প্রক্রিয়া, গেট কন্ট্রোল, অনলাইন বিলিং - সবকিছুই কম্পিউটারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী সিটিএমএস প্রকল্পের সফল ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে বন্দর ব্যবহারকারীদের খরচ প্রায় অর্ধেক কমে যাবে। শুধুমাত্র অনলাইনে আমদানি-রপ্তানি চালান (menifest) দাখিল করেই ব্যবসায়ীরা পণ্য খালাস নিতে পারবেন। এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালের ৩০ জুন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কাছ থেকে সিটিএমএস প্রকল্পের দায়িত্ব বুঝে নেয়।

২.৩.২.১ বন্দরে অটোমেশনের ইতিবাচক পরিবর্তন

বন্দরে অটোমেশন বা সিটিএমএস বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমানে ইন্টারনেট বা মোবাইলের মাধ্যমে টার্মিনালের বিভিন্ন ইয়ার্ডে কন্টেইনারের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া কাস্টম হাউজের অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে আমদানি পণ্যের আইজিএম সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্দর হতে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় পণ্যের শুল্কায়ন সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করতে পারছে। সর্বোপরি, জাহাজ বন্দরে বার্থিং-এর পূর্বেই কন্টেইনার লোডিং-আনলোডিং ও ইয়ার্ডে সংরক্ষণ সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে।

২.৩.২.২ বন্দরে অটোমেশন বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা

বন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা বা সিটিএমএস প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে বন্দর কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ২০১১-১২ সালের তুলনায় ২০১২-১৩ সালে বন্দরে জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ও দৈনিক জাহাজ প্রতি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে উল্লেখযোগ্য কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

১. ***অসম্পূর্ণ প্রকল্প:*** চুক্তি অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়নসাপেক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প হস্তান্তর হওয়ার শর্ত থাকলেও হস্তান্তরের পর প্রায় একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রকল্পের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রতিনিধি ডেটাসফটের মতে এখনো বন্দরের বিলিং মডিউল তৈরি হয়নি এবং ৬৮টি এমআইএস রিপোর্টের মধ্যে ২০টি রিপোর্ট এখনো তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বা শতভাগ বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের মূল সরবরাহকারী এসটিই'কে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষের মতে সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও নিয়ম মেনেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

   বন্দরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী সিটিএমএস প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিলিং মডিউল ছাড়া সকল মডিউল তৈরি এবং কাস্টমাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। বিলিং মডিউলটিও যথাশীঘ্র তৈরি হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় কিছু পূর্বশর্ত পূরণ না করার কারণে প্রস্তুতকৃত সকল মডিউল ব্যবহার বা সিটিএমএস প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রপ্তানি কন্টেইনারসমূহ জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাট-অফ (Cut off) টাইম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হওয়া; সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহারকারীদের আগ্রহ ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব; বন্দরের অভ্যন্তরে কন্টেইনার স্ট্রিপিং (ইয়ার্ডে কন্টেইনার খুলে পণ্য সরবরাহ) চালু থাকা; এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক লজিস্টিক সাপোর্টের (সুশৃঙ্খল ইয়ার্ড, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রাক ড্রাইভার ও পরিবহণ শ্রমিক ইত্যাদি) অভাব। অন্যদিকে অটোমেশন বা সিটিএমএস ব্যবহারকারী বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতে, সিটিএমএস প্রকল্পের হস্তান্তর সম্পন্ন হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় মডিউল তাদেরকে সরবরাহ করা হয়নি। বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম এখনো পূর্বের প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সিটিএমএস প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রতিনিধি ডেটাসফটের মতে বন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনীহার কারণে সিটিএমএসের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

২. ***প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা:*** সরবরাহকারীদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী ২০১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর সিটিএমএস উদ্বোধনের পরবর্তী চারমাস 'গো-লাইভ ট্রায়াল' হিসেবে পরিচালিত হওয়া এবং উক্ত ট্রায়াল পিরিয়ডের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাস্টমাইজেশনসহ সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করে তা সমাধানের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু তিন দফায় প্রায় ১৫ মাস অতিরিক্ত সময় গ্রহণ করার পর প্রকল্প হস্তান্তর করা হয়। এমনকি উদ্বোধন পরবর্তী দুই বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বন্দরে এখনো সিটিএমএস পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা যায়নি।

৩. ***দুর্বল নেটওয়ার্ক:*** সিটিএমএস-এর সফল বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বন্দর ব্যবহারকারী সকল ইউজার এন্ডের কানেক্টিটিভিটি। চুক্তি অনুযায়ী বন্দরে সিটিএমএস-এর জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপনের কথা থাকলেও, পরবর্তীতে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করে ওয়ারলেস 'মেশ (Mesh)' প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়ারলেস প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ফাইবার অপটিকের প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়নি। এছাড়া জিসিবি'র ১ নং থেকে ৫ নং জেটিতে নেটওয়ার্ক স্থাপিত না হওয়ায় বাল্ক কার্গোতে পরিবাহিত কন্টেইনার সিটিএমএসের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে না। জিসিবি এলাকায় সিটিএমএস নেটওয়ার্কের 'এপি'গুলো (Access Point) মাঝে মাঝে ডাউন হয়ে যায়, যা সার্বিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে বর্তমানে অনেক স্থানেই ভিএমটি (VMT) ও এইচএইচটি (HHT) ব্যবহার করে ডাটা এন্ট্রির জন্য নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। বিশেষকরে ইয়ার্ড অফিস ও শেডের ছাউনিসহ বিভিন্ন টার্মিনাল ও বার্থে প্রায় সময়ই নেটওয়ার্ক থাকে না।

কিন্তু বন্দরের প্রকল্প ব্যবস্থাপকের মতে, বন্দরের জেটি ও টার্মিনালের প্লাটফরম অনেক ভারি কন্টেইনার ধারণের উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় শক্ত কংক্রিট ঢালাই ব্যবহারের কারণে বন্দরে আন্ডারগ্রাউন্ড ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপন সাশ্রয়ী ও সহজসাধ্য ছিল না। তাই বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে চুক্তির শর্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে ওয়ারলেস 'মেশ' প্রযুক্তিতে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র সিসিটি'র পরিবর্তে এনসিটি এবং জিসিবি'র কিছু অংশ বর্ধিত নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে কার্যকর সাপোর্ট দিতে পারছে না। তবে বর্তমানে পর্যাপ্ত 'এপি' স্থাপনের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত দুর্বলতা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৪. ***প্রকল্প হস্তান্তর-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণে সীমাবদ্ধতা:*** চুক্তি অনুযায়ী সিটিএমএস প্রকল্প বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর-পরবর্তী চারবছরের জন্য প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণে সকল ধরনের সহায়তার দায়িত্ব ডেটাসফটের। কিন্তু সিটিএমএসে ব্যবহৃত অ্যান্টি-ভাইরাস প্রোগ্রামগুলো ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তা আপডেট করা হয়নি। প্রায়ই সিটিএমএস বিকল বা সিস্টেম হ্যাং হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একটি সূত্র মতে, সিটিএমএস চালুর পর ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দুই বছরের মধ্যে প্রায় ৭০ বারের বেশি বিকল হয়েছে; ২০১৩ সালের ২১ অক্টোবর এটি একাধারে দুইদিনের বেশি বিকল অবস্থায় ছিল। এর কারণ হিসেবে মানসম্মত ব্রান্ড সার্ভারের পরিবর্তে নিম্নমানের ক্লোন সার্ভার ব্যবহার করার অভিযোগ হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্কস্টেশনে স্থাপিত ইউপিএস থেকে ব্যাকআপ না পাওয়ায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায় এবং রেডিও নেটওয়ার্কের সমস্যা হয়।

চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে সিটিএমএস সিস্টেমটি বার্ষিক ১ মিলিয়ন টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা সম্পন্ন হবে, যা প্রতি বছর ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের ঠিকাদার প্রকল্প হস্তান্তর পরবর্তী ১ বছর ওয়ারেন্টি পিরিয়ডসহ আরও ৪ বছরের জন্য প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে ১ মিলিয়নের বেশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য 'নেভিস এন-ফোর' সফটওয়্যারের আপডেট প্রয়োজন। কিন্তু প্রকল্পের ঠিকাদার এই সফটওয়্যার আপডেট করছে না।

৫. ***প্রকল্পের বাস্তবায়িত অংশের যথাযথ ব্যবহার না হওয়া:*** সিটিএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট বা মোবাইলে কন্টেইনারের অবস্থান জানা সম্ভব হলেও এখনো আমদানি পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার শুরুতেই বন্দরে সংশ্লিষ্ট 'কন্টেইনার সার্টিফাই' সেকশনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে পণ্যের সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই সিটিএমএস-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কন্টেইনার ঠিক জায়গায় পাওয়া যায় না এবং সেটা পাওয়ার জন্য ট্রাফিক ইনসপেক্টর, অপারেটর সবার কাছে পুনরায় খোঁজ নিতে হয়।

সিটিএমএস এর লেবার অ্যালোকেশন মডিউল, ভেসেল বার্থিং মডিউল তৈরি হলেও বন্দর কর্তৃক ব্যবহার করা হয় না। বিলিং মডিউল তৈরি না হওয়ায় পূর্বে ব্যবহৃত বন্দরের নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমেই যাবতীয় বিলিং এর কাজ করা হচ্ছে। সিটিএমএস-এর মাধ্যমে প্রতিদিনের কন্টেইনার ডেলিভারি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না - এখনো পুরানো পদ্ধতিতে বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

৬. ***পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসরণ:*** পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় ম্যানুয়াল পদ্ধতির কিছু প্রশাসনিক ধাপ হ্রাস পেলেও পুরো আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় ধাপসমূহের অধিকাংশ এখনো বিদ্যমান। বন্দরে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের নামে একটি কক্ষে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হলেও এখানেও নথিপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পূর্ববর্তী ধাপগুলো বিদ্যমান। বন্দরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কন্টেইনার টার্মিনালে কন্টেইনারের অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হলেও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার অন্যান্য ধাপসমূহে অটোমেশনের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না।

২.৩.৩ *পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি*

পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের নামে একই কক্ষ থেকে আইজিএম যাচাই, বন্দরের বিল তৈরি, ব্যাংকে বিল পরিশোধ, এবং বিল পরিশোধের রশিদ প্রত্যয়ন (Endorsement) করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন টেবিলে ফাইল নিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। একইভাবে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপসমূহেও তাদেরকে সশরীরে উপস্থিত থেকে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অনুমতি গ্রহণ এবং যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত নথিপত্র ও প্রতিবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার মাধ্যমে পণ্য ছাড় করাতে হয়।

পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সুযোগে বিভিন্ন অনিয়মকে পাশ কাটাতে অথবা উদ্দেশ্যমূলক হয়রানি এড়াতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেখানে উভয়পক্ষের স্বার্থ জড়িত, সেখানে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ অনিয়মের ধরন এবং উক্ত অনিয়মের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। তবে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অনিয়ম না থাকলেও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার প্রায় প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অলিখিতভাবে নির্ধারিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয় (সারণি ৬)।

সারণি ৬: বন্দরে আমদানি পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের চিত্র

<table>
<tr><th>এলসিএল পণ্য</th><th>অর্থের পরিমাণ</th><th>এফসিএল পণ্য</th><th>অর্থের পরিমাণ</th><th colspan="2">অন চেসিস ডেলিভারি</th><th>অর্থের পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>কন্টেইনার সার্টিফাই
(পণ্যের অবস্থান জানা)</td><td>৫০</td><td>কন্টেইনার সার্টিফাই
(পণ্যের অবস্থান জানা)</td><td>৫০</td><td colspan="2">কন্টেইনার সার্টিফাই
(পণ্যের অবস্থান জানা)</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>ওয়ান স্টপ সেকশন -
আইজিএম যাচাই, বিল তৈরি, বিল পরিশোধ, বিল এন্ডোর্সমেন্ট</td><td>২৫০</td><td>ওয়ান স্টপ সেকশন -
আইজিএম যাচাই, বিল তৈরি, বিল পরিশোধ, বিল এন্ডোর্সমেন্ট</td><td>২৫০</td><td colspan="2">ওয়ান স্টপ সেকশন -
আইজিএম যাচাই, বিল তৈরি, বিল পরিশোধ, বিল এন্ডোর্সমেন্ট</td><td>২৫০</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>কন্টেইনার ইনডেন্ট</td><td>৫০</td><td colspan="2">কন্টেইনার ইনডেন্ট</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>অনুমতি পত্র - ট্রাফিক ইন্সপেক্টর
(শেড)</td><td>৫০</td><td>অনুমতি পত্র- ট্রাফিক ইন্সপেক্টর
(ইয়ার্ড)</td><td>৫০</td><td rowspan="3">অন-চেসিস অনুমতি গ্রহণ</td><td>অনুমতি পত্র তৈরি - ক্লার্ক</td><td>১০০</td></tr>
<tr><td>ওয়্যার হাউজ এন্ট্রি - শেড ইন্সপেক্টর</td><td>৫০</td><td>কন্টেইনার খোলার অনুমতি
(এএসআই + চেকার + টিআই)</td><td>-</td><td>অনুমতি স্বাক্ষর - টিও</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>লক পাস- ক্লার্ক
(মূল্যবান পণ্যের ক্ষেত্রে)</td><td>৫০</td><td>কন্টেইনারের লক খোলা -
(রিভিটার)</td><td>৫০</td><td>ট্রেলার নম্বর গ্রহণ ও অনাপত্তি পত্র প্রদান - সিকিউরিটি</td><td>১৫০</td></tr>
<tr><td>ক্রেন
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)</td><td>৫০০*</td><td>ক্রেন
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)</td><td>৫০০*</td><td colspan="2">অনুমতিপত্র গ্রহণ
(ইয়ার্ড ইন্সপেক্টর)</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>হাইস্টেয়ার
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)</td><td>৮০০*</td><td>হাইস্টেয়ার
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)</td><td>৮০০*</td><td colspan="2">সিটিএমএস বুথ-
পিক আপ টোকেন গ্রহণ</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>পণ্য লোডিং - চেকার
(সিনিয়র আউটডোর অ্যাসিসটান্ট)</td><td>৫০</td><td>পণ্য লোডিং - চেকার</td><td>৫০</td><td colspan="2">কন্টেইনার কিপ ডাউন - চেকার</td><td>১০০</td></tr>
<tr><td>কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান
(হেড ডেলিভারি)</td><td>৫০</td><td>কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান
(হেড ডেলিভারি)</td><td>৫০</td><td colspan="2">কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান
(হেড ডেলিভারি)</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান
(এএসআই)</td><td>৫০</td><td>কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান
(এএসআই)</td><td>৫০</td><td colspan="2">কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান (এএসআই)</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান
(চেকার)</td><td>৫০</td><td>কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান
(চেকার)</td><td>৫০</td><td colspan="2">কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান (চেকার)</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>গাড়ীতে পণ্য চেকিং- এআরও
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)</td><td>-</td><td colspan="2">পণ্য স্ক্যানিং</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>গেট ভেরিফিকেশন-
কাস্টম অফিসার</td><td>৫০</td><td>গেট ভেরিফিকেশন-
কাস্টম অফিসার</td><td>৫০</td><td colspan="2">গেট ভেরিফিকেশন-
কাস্টম অফিসার</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>চেকিং- গেট সার্জেন্ট</td><td>৫০</td><td>চেকিং- গেট সার্জেন্ট</td><td>৫০</td><td colspan="2">চেকিং- গেট সার্জেন্ট</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>চেকিং- গেট সিকিউরিটি</td><td>৫০</td><td>চেকিং- গেট সিকিউরিটি</td><td>৫০</td><td colspan="2">চেকিং- গেট সিকিউরিটি</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৮০০</td><td>মোট</td><td>৮০০</td><td colspan="2">মোট</td><td>১২০০</td></tr>
</table>

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, সাধারণত বন্দর হতে প্রতিটি এফসিএল বা এলসিএল কনসাইনমেন্টের পণ্য ছাড়ের জন্য ন্যূনতম মোট প্রায় ৮০০ টাকা এবং অন চেসিসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রায় ১২০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়। উল্লেখ্য, 'বিশেষ অনুমতি' গ্রহণের মাধ্যমে জরুরি পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রায় ৩০০ টাকা দিতে হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে, প্রতিদিন বন্দরে গড়ে প্রায় ২,০০০[১২] টিইইউস আমদানি কন্টেইনার খালাসে কন্টেইনার প্রতি ন্যূনতম ৮০০ টাকা হিসেবে ন্যূনতম মোট প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে উত্তোলন করা হয়। এক্ষেত্রে বাল্ক কার্গোর আমদানি পণ্যের ছাড় প্রক্রিয়া এবং রপ্তানি পণ্যের জাহাজীকরণ প্রক্রিয়ায় আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত নয়।

২.৪ অন্যান্য অংশীজন সংশ্লিষ্ট অনিয়ম

২.৪.১ ফিডার ভেসেল অপারেটর (Feeder Vessel Operator)

পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার মত জাহাজ বার্থিং করার ক্ষেত্রেও ফিডার ভেসেল অপারেটরদের বন্দর ও কাস্টম হাউজে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। তথ্যদাতাদের মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ভেসেল অপারেটরদের মধ্যে অনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে (Collusive corruption) নিয়মভঙ্গের ঘটনাকে পাশ কাটানের উদ্দেশ্যে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ বা ঘুষ আদায় করা হয়। ব্যবসায়িক ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করে ফিডার ভেসেল অপারেটর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ঘুষ দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ফিডার অপারেটর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেন, "We don't pay bribe, it is exception creation fees, as exception creates business"। তবে কিছু ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গ না হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়।

সারণি ৭: জাহাজ বর্থিং প্রক্রিয়ায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের চিত্র

	নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্র	জাহাজ প্রতি ন্যূনতম অর্থ আদায়ের পরিমাণ
কাস্টম	অন বোর্ড – কাস্টম বুকিং	৫০০ টাকা
	কাস্টম ইমিগ্রেশন - শোর পাস	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	অন বোর্ড – কাস্টম (বন্ড সিল, স্টোর লিস্ট..)	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	অন বোর্ড – ব্লাক গ্যাং (রামেজ টিম - কাস্টম)	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	পোর্ট ক্লিয়ারেন্স - কাস্টম হাউজ	৫০০ টাকা
	ফাইনাল এন্ট্রি – কাস্টম হাউজ	৫০০ টাকা
নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন	৫০০ টাকা
বন্দর	পোর্ট ক্লিয়ারেন্স - বন্দর	২০০ টাকা
	পোর্ট ডিক্লারেশন – রেডিও কন্ট্রোল	২০০ টাকা
	ওয়াটার পাম্প	৩০০ টাকা
	অন বোর্ড – পোর্ট হেলথ (কোয়ারেনটাইন)	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	অন বোর্ড – পাইলট	২ কার্টুন সিগারেট (৩,৫০০ টাকা)
	ওভার ড্রাফট (প্রতি ইঞ্চি) – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	বাও ব্রিজ (Bow Bridge) জাহাজ নেভিগেশন – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	নাইট নেভিগেশন (১৫৩ মিটার) – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	নাইট নেভিগেশন (১৫৩+ মিটার - পাইলট++	২৫,০০০ টাকা
	ভাটায় নেভিগেশন – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	ওভার লেন্থ (১৮০+ মিটার) – পাইলট++	৩০,০০০ টাকা

বন্দরের বার্থিং মিটিংয়ে জাহাজের বার্থিং সম্পর্কে প্রাথমিক ঘোষণা দেওয়ার পর নৌ-মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রিন্সিপাল অফিস অফ মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট হতে অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিতে হয়। পরবর্তীতে কাস্টম হাউজ ও বন্দর হতে

[১২] ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট আমদানিকৃত কন্টেইনার ৭,৪৩,৫৪৭ টিইইউস।

পোর্ট ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ন্যূনতম ৫০০ টাকা ও ২০০ টাকা দিতে হয়। পরবর্তীতে জাহাজ বন্দরে বার্থিংয়ের পর অন বোর্ড কাস্টম বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিতে হয়। পুনরায় জাহাজে অন বোর্ড পরীক্ষণ শেষে স্টোর লিস্ট তৈরি, বন্ড সিলসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ শেষে প্রতিবেদন প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাস্টম কর্মকর্তাকে ন্যূনতম তিন কার্টন বিদেশী সিগারেট বা সমপরিমাণ বিদেশী অ্যালকোহলের বোতল দিতে হয়। এছাড়া কাস্টমসের রামেজ টিম ব্লাক গ্যাং এবং বন্দরের কোয়ারেনটাইন সেকশন বা স্বাস্থ্য বিভাগকেও ন্যূনতম তিন কার্টন বিদেশী সিগারেট বা সমপরিমাণ বিদেশী অ্যালকোহলের বোতল দিতে হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়মানুসারে বহিঃনোঙ্গর হতে বন্দরের চ্যানেলে জাহাজ নিয়ে আসা ও বার্থিংয়ের জন্য এবং একইভাবে বন্দর হতে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বন্দরের নিজস্ব পাইলটের সহায়তা নিতে হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পাইলটকে ন্যূনতম দুই কার্টন সিগারেট বা সমপরিমাণ বিদেশী অ্যালকোহলের বোতল দিতে হয়। তবে জাহাজের ড্রাফট বা লেন্থ বন্দর কর্তৃক অনুমোদিত সীমার বেশি হলে সংশ্লিষ্ট পাইলটকে অতিরিক্ত নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। বন্দরে আসা এবং ছেড়ে যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই জাহাজের প্রতি ইঞ্চি অতিরিক্ত ড্রাফটের জন্য ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা করে দিতে হয়। তবে ওভার ড্রাফটের পরিমাণ যদি ১০ ইঞ্চি থেকে বেশি হয়, তাহলে প্রতি ইঞ্চির জন্য ৭,০০০ টাকা হিসেবে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। জাহাজের বাও ব্রিজ হলে সেক্ষেত্রেও পাইলটকে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ৫,০০০ টাকা দিতে হয়।

বন্দরের নিয়মানুসারে রাতে অনধিক **১৫৩**মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজের নাইট নেভিগেশনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পাইলটকে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা দিতে হয়। তবে নাইট নেভিগেশনের ক্ষেত্রে জাহাজের দৈর্ঘ্য **১৫৩** মিটার অপেক্ষা কিছু বেশি হলে সংশ্লিষ্ট পাইলট এবং হারবার ডিপার্টমেন্টকে জাহাজ প্রতি ন্যূনতম ২৫,০০০ টাকা ঘুষের বিনিময়ে ম্যানেজ করা হয়। তেমনি ভাবে দিনে নেভিগেশনের জন্য জাহাজের অনুমোদিত সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য **১৮৬** মিটার হলেও, **১৮০** মিটারের অধিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জাহাজের বার্থিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পাইলটকে জাহাজ প্রতি ন্যূনতম ৩০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

বন্দরের হারবার বিভাগ ও পাইলট সিন্ডিকেটকে ম্যানেজ করে নির্ধারিত সময়ে জাহাজ জেটিতে বার্থিং করাতে না পারলে বহিঃনোঙ্গরে জাহাজের অতিরিক্ত অবস্থানের জন্য ফিডার ভেসেল অপারেটরকে প্রতিদিন **১১**,০০০ মার্কিন ডলার হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধ করতে হয়। অন্যদিকে, ফিডার ভেসেল একদিন দেরি করে ছাড়লে মাদার ভেসেলের নির্ধারিত শিডিউল ধরতে ফিডার ভেসেলের গতি বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধ করতে হয়। আবার প্রতি ইঞ্চি ওভার ড্রাফটের মাধ্যমে ন্যূনতম ৫০ টিইইউস কন্টেইনার বেশি পরিবহণ করা সম্ভব। এই ধরনের অতিরিক্ত চার্জ সংক্রান্ত ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন না হওয়ার জন্য বন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পাইলটদের ঘুষ দিতে হয়।

২.৪.২ অফ ডক বা প্রাইভেট কন্টেইনার ডিপো (Off Dock)

চট্টগ্রামে প্রায় **১৬**টি অফ ডক বা বেসরকারি কন্টেইনার ডিপো রয়েছে। এসকল অফ ডকের প্রধান কাজ হচ্ছে- বন্দর কর্তৃক নির্দিষ্ট ২৯ ধরনের আমদানি পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের নিকট আমদানি পণ্য হস্তান্তর এবং সকল ধরনের রপ্তানি পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, কন্টেইনারে আমদানি পণ্য স্টাফিং ও নিজস্ব ট্রেইলারের মাধ্যমে রপ্তানি কন্টেইনার জাহাজীকরণ। এমএলও কর্তৃক নির্ধারিত ডিপো প্রতিনিধি আমদানি পণ্যবাহী কন্টেইনার বন্দর থেকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সিটিএমএস-এ সংশ্লিষ্ট কন্টেইনারের তথ্য যাচাই সাপেক্ষে টার্মিনাল ভবনের শিপিং সেকশন থেকে ট্রিপ টিকেট সংগ্রহ করে। ট্রিপ টিকেট দেখিয়ে নির্ধারিত স্থান থেকে ডিপোর ট্রেইলার কন্টেইনার সংগ্রহ করে। কন্টেইনার কাস্টম কর্তৃক স্ক্যানিং করার পর ডিপো প্রতিনিধি ইআইআর (Equipment Interchange Report) চালান সংগ্রহ করে। এরপর বন্দরের গেটে সার্জেন্ট এবং গেট কাস্টম কর্তৃক চেকিং হয়ে কন্টেইনার ছাড় করে নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য, ডিপোতে কাস্টম হাউজের প্রতিনিধি হিসেবে সহকারী কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে বা কনসাইনমেন্ট সম্পর্কিত কোনো সন্দেহজনক তথ্য থাকলে উক্ত কনসাইনমেন্টের কন্টেইনার খুলে পরীক্ষা করতে পারেন।

রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ডিপোর বন্ডেড ওয়ারহাউজে পণ্য আসলে কাভার্ড ভ্যান বা পণ্যবাহী পরিবহন থেকে পণ্য আনলোড করা হয়। সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কাস্টম হাউজে সংশ্লিষ্ট কনসাইনমেন্টর শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাস্টমের বিল পরিশোধ করে। ইতিমধ্যে ডিপোতে এমএলও বা ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের নির্দেশনা অনুযায়ী কন্টেইনারে পণ্য স্টাফিং করা হয়। ডিপোতে কাস্টমের প্রতিনিধি প্রয়োজন অনুযায়ী কন্টেইনারের পণ্য পরীক্ষা করে থাকে। ডিপো থেকে পণ্যের ধরন, পরিমাণ ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত বিল-অফ-এক্সপোর্ট কাস্টম প্রতিনিধি এন্ডোর্স (Endorse) করে দেয়। এমএলও-র মাধ্যমে জাহাজের শিডিউল ও যাত্রাপথের বিবরণ জানার পর ডিপো তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদার বিবরণ জানালে এমএলও শিপমেন্ট অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে সিটিএমএস থেকে নির্দিষ্ট জাহাজে কন্টেইনার জাহাজীকরণের অনুমতি পাওয়ার পর ডিপো থেকে কন্টেইনার বন্দরের জেটিতে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, বন্দরের গেট দিয়ে কন্টেইনার ঢোকার সময় কাস্টম থেকে স্ক্যানিং করা হয় এবং সিটিএমএস-এর তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কন্টেইনারের প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করে অনুমতি দেওয়া হয়।

বন্দর হতে আমদানি পণ্য গ্রহণ এবং বন্দরে রপ্তানি পণ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে বন্দর ও কাস্টম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বিভিন্ন ধরনের অনুমতি গ্রহণের জন্যও নিম্নলিখিত হারে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়।

সারণি ৮: অফ ডক হতে বন্দরে কন্টেইনার পরিবহণ প্রক্রিয়ায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের চিত্র

নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়কারি	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
টার্মিনাল ভবন (কর্মকর্তা)	২,০০০ (প্রতি মাস)
গেট কাস্টম (অফডক সেকশন)	২,০০০ (প্রতি মাস)
খালি কন্টেইনার বের করার অনুমতি - কাস্টম ক্লার্ক	১,০০০ (প্রতি মাস)
গেট সার্জেন্ট	২০০ (প্রতি শিফট)
সিটিএমএস বুথ	১০০ (প্রতি শিফট)
বন্দর গেট- এন্ট্রি ম্যান	১০০ (প্রতি শিফট)

বন্দরের টার্মিনাল ভবনে সংশ্লিষ্ট টার্মিনাল কর্মকর্তার সাথে প্রতি মাসে ন্যূনতম ২০০০ টাকা মাসিক চুক্তি করা থাকে। একইভাবে, গেট কাস্টমের জন্য সংশ্লিষ্ট অফ ডক সেকশন এবং খালি কন্টেইনার বের করার অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টম ক্লার্কের সাথে যথাক্রমে প্রতি মাসে ন্যূনতম ২,০০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা চুক্তি করা থাকে। এছাড়া বন্দরে অফ ডকের কন্টেইনারবাহী ট্রেইলার প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য শিফট অনুযায়ী গেট সার্জেন্ট, সিটিএমএস বুথ ও গেটের এন্ট্রিম্যানকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়।

৩. উপসংহার

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৮৭ শতাংশ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম বন্দর ও সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ হতে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজ উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অটোমেশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে এই অটোমেশন বাস্তবায়নের প্রায়োগিক সফলতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ও বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ বিদ্যমান। অন্যদিকে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মতে এখনও শতভাগ অটোমেশন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

বর্তমান প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন বাস্তবায়নের পর্যালোচনায় দেখা যায়- উভয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমে অটোমেশন বাস্তবায়নের কিছু ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের কার্যকর সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্য পরীক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংক এবং পণ্য পরীক্ষণের সাথে সম্পর্কিত বিএসটিআই, বুয়েট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জেটিতে পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া অটোমেশনের আওতাভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে বন্দরে অটোমেশনের মাধ্যমে কন্টেইনার ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তবায়িত সিটিএমএস এর প্রস্তুতকৃত মডিউলসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এমনকি, সিটিএমএস ক্রয়, বন্দর কর্তৃক সিটিএমএস-এর দায়িত্ব গ্রহণ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

অটোমেশনের অসম্পূর্ণ বাস্তবায়নের সুযোগে পণ্যের শুল্কায়ন এবং আমদানি পণ্য ছাড় ও রপ্তানি পণ্যের জাহাজীকরণ প্রক্রিয়ায় আমদানিকারক-রপ্তানিকারক প্রতিনিধিদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাতের বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষের নিয়মিত মিথস্ক্রিয়ার সুযোগে পণ্যের শুল্কায়ন, পণ্য ছাড় ও জাহাজীকরণ প্রক্রিয়ায় অনৈতিক ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে কাস্টম হাউজে আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন সম্পন্নে ন্যূনতম **১১**টি ধাপ এবং কায়িক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত **৬**টি ধাপসহ মোট **১৭**টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তবে রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম অনধিক **৬**টি ধাপে শুল্কায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। একইভাবে বন্দর হতে আমদানিকৃত এলসিএল পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম **১৬**টি ধাপ এবং এফসিএল পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম **১৯**টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার প্রায় প্রতিটি ধাপ অতিক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, আমদানি পণ্যের শুল্কায়নে প্রতি কনসাইনমেন্টে ন্যূনতম প্রায় ৩,০০০ টাকা, কায়িক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কন্টেইনার প্রতি অতিরিক্ত ন্যূনতম প্রায় ৪,০০০ টাকা এবং রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়নে কনসাইনমেন্ট প্রতি ন্যূনতম প্রায় ৫০০ টাকা

নিয়ম বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়। অন্যদিকে, আমদানি পণ্যের ছাড় প্রক্রিয়ায় কন্টেইনার প্রতি ন্যূনতম প্রায় ৮০০ টাকা নিয়ম বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়। ২০০৫ সালে পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ৩০ টি স্থানে ন্যূনতম প্রায় ৪২০০ টাকা আদায় করা হতো, যা ২০০৭ সালে ৩০ টি স্থানে ন্যূনতম প্রায় ৩৩০০ টাকায় কমে এসেছিল। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় এক্ষেত্রে ন্যূনতম মোট ২৭ টি ধাপ অতিক্রমে ১৯ টি স্থানে ন্যূনতম প্রায় ৩৮০০ টাকা নিয়ম বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয় (রহমান, ২০০৫; মাহমুদ ও রোজেটি, ২০০৭)। অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে পণ্যের শুল্কায়ন ও ছাড় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় সংক্রান্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ব্যবসায়ীদের অনৈতিকভাবে অতিরিক্ত মুনাফালাভের প্রত্যাশায় আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে শুল্ক ফাঁকির প্রবণতা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী উভয় পক্ষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতায় অনেকক্ষেত্রে উইন-উইন অবস্থা বিদ্যমান। অসাধু ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের এই ধারাবাহিক চর্চা সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সার্বিকভাবে মনিটরিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করার সুযোগে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ও ঘুষ দেওয়ার ঘটনা অনেকক্ষেত্রেই অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

অটোমেশন প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করার মত সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি অটোমেশনের সফল বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ মনিটরিং ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সুপারিশ

১. শুল্কায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনলাইন সুবিধার আওতাভুক্ত করতে হবে।
২. বন্দরে সিটিএমএস-এর পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সকল মডিউল প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে হবে।
৩. বন্দরে বাল্ক পণ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য অটোমেশন বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. বন্দরের অভ্যন্তরে কন্টেইনার খুলে পণ্য ডেলিভারি বন্ধ করতে হবে।
৫. স্বাধীন, নিরপেক্ষ তৃতীয় কোনো পক্ষের মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে বন্দর ও কাস্টম হাউজের কর্মদক্ষতা ও অটোমেশনের কার্যকরতা পরিমাপে "পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন" করতে হবে।
৬. কাস্টম হাউজ ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. কাস্টম হাউজ ও বন্দরে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধে এ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. কাস্টম হাউজ ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৯. বছরে একবার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. http://allwebinfobd.blogspot.com/2011/10/historical-background-of-chittagong-port_7792.html accessed on December 2013.
২. http://chc.gov.bd/imp/ accessed on 28 April 2014.
৩. Munisamy, S., and Sing, G.. (2011). Benchmarking the Efficiency of Asian Container Ports. *African Journal of Business Management* . Vol 5 (4), p1397-1407.
৪. Overview 2013, Chittagong Port Authority.
৫. www.containershipping.com accessed on 28 April 2014.
৬. মাহমুদ, ত., রোজেটি, জ., *চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা ও সম্ভাবনা: ফলোআপ ডায়াগনস্টিক স্টাডি*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।
৭. মাহমুদ, ত., রোজেটি, জ., *চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৮।
৮. রহমান, স., *চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর: একটি ডায়াগনস্টিক স্টাডি*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৫।

পরিশিষ্ট-১

শুল্কায়নের জন্য দাখিলকৃত দলিলসমসূহ:

- বি/ই দাখিলকারীকে পণ্য চালান শুল্কায়ন ও খালাসের লক্ষ্যে আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতায়ন পত্র;
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত লেটার অফ ক্রেডিট অথরাইজেশন (LCA) এর কাস্টম কপি;
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি/ঋণপত্র) বা ক্রয়চুক্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর কাস্টম কপি;
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত ইনডেন্ট/ প্রোফর্মা ইনভয়েস/সেলস কনট্রাক্ট (যে ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য);
- ব্যাংক প্রত্যায়িত মূল ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট এবং পিএসআইকৃত চালানের ক্ষেত্রে পিএসআই সংস্থা ও ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত ইনভয়েস;
- মূল্য ঘোষণা ফরম;
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত সিআরএফ সনদপত্র ব্যাংক কপি;
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত মূল বিল অফ লেডিং;
- পণ্য চালান সংশ্লিষ্ট ইন্সুরেন্স কভার নোট ও বীমা পলিসি নথিপত্র;
- কান্ট্রি অফ অরিজিন সার্টিফিকেট;
- বিল অফ এক্সচেঞ্জ এর কপি;
- আমদানিকারক/সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত ডাটা সিট।